জঙ্গল থেকে জনারণ্য

জঙ্গল থেকে জনারণ্য

মলয়রঞ্জন আইচ সরকার

বুক্‌স টুডে। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা,
১/৩, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
[আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোস্ট অফিসের বিপরীতে শিব মন্দিরের গলিতে ঢুকে ডান হাতে]

“JANGAL THEKE JANARANYA”

BY

MALAY RANJAN AICH SARKAR

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আগষ্ট, ১৯৯০

এজেন্ট ঃ বিশ্বাস বুক ষ্টল, কলকাতা।

শংকর চক্রবর্তী, বারাসাত, উঃ চব্বিশ পরগণা কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ কে চক্রবর্তী, একের
তিন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা নয় দ্বারা মুদ্রিত।

আমার কথা

"জঙ্গল থেকে জনারণ্য" বইটির সম্বন্ধে ক'টি কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমার বুকটা গর্বে ভরে ওঠে যে পশ্চিমবঙ্গ আমার জন্মভূমি আর এর বুকেতেই রয়েছে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের গর্ব এবং আলোচনা-সমালোচনার শহর তিলোত্তমা কলকাতা। এই শহরেই জন্মেছেন কত শত মনিষী বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণ যাঁদের নাম লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

কিন্তু আজকের এই কলকাতা কি সেই জোব চার্নকের সময় এমনটিই ছিল? না ছিল না। কিছুই ছিলনা। ছিল শুধু হোগলার বন আর জল-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জোব চার্নক তার মানস কন্যাকে শুধু জন্ম দিয়েই গেছেন, লালন-পালন করে যেতে পারেন নি।

সেই পর্তুগীজ থেকে শুরু করে ইংরেজ বানিয়াদের কালো হাত বার বার থাবা বসিয়েছে কলকাতার বুকে। শোষণ করেছে দিনের পর দিন। সেইসব শোষকেরা কলকাতাকে শোষণ করে আপনাদের দেশে বানিয়েছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা ইমারত, কোটি কোটি টাকা নিয়ে গিয়ে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। সেই শোষণের পালা সমানে চলেছে এখনও। স্বদেশীরাও অতীতে ছিল শোষণের পক্ষে। তারা এখনো কলকাতাকে শোষণ করার কৌশল করছে। আবার তারাই ফিসফিসিয়ে বলে কলকাতা মৃত নগরী—মুমূর্ষু নগরী!

আমার বিনীত প্রশ্ন সেইসব সবজান্তা মানুষগুলোর কাছে—কোন অধিকারে বলছে কলকাতা মৃত নগরী? কোথায় পেল এ অধিকার? একবারের জন্যও ভেবে দেখেছে কতটুকু দিয়েছ তাকে? তার হৃষ্টপুষ্টতার জন্য কতটুকু ভাবনা ভেবেছে? কিন্তু শত বাধা বিপত্তি আর অবহেলার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তিল তিল করে আজ তিলোত্তমা কলকাতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ঐ বিশ্বাকাশে। বিশ্বের জনগণকে

ডেকে সে বলছে—দেখে যাও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের গর্ব কলকাতাকে। বুক ফুলিয়ে বলছে, দেখ কত লক্ষ মানুষকে আমার বুকে ধারণ করেছি, বুকের স্তন দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। কি নেই আমার? আমার সব আছে। নেই শুধু শোষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা। সেটুকু তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি। অনুনয় করে বলছি, আমাকে কালিমালিপ্ত করো না। সাজিয়ে রাখ সযত্নে ঠিক যেমন করে তোমার আপন সন্তানেরে মনের মতো করে সাজিয়ে দাও। সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে পৌঁছে দাও বিশ্বের দরবারে।

বাংলার রূপকার ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু রয়েছেন দ্বিতীয় রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনিই পারবেন আমাদের কলকাতাকে আরও সুন্দর করে তুলতে। আমরা তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছি—কারণ তিনি ছাড়া আর কে ভাববেন এ কলকাতাকে নিয়ে?

১লা আগষ্ট, ১৯৯০

বিনীত—

শ্রীমলয়রঞ্জন আইচ সরকার

অতীত ও বর্তমানের কলকাতা গড়ার কারিগরদের

সৌজন্যে—

জোব চার্ণক

প্রথম অধ্যায়

কলকাতা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর, ভারতের প্রধান শহর ও দ্বিতীয় বন্দর। পশ্চিমবাংলার রাজধানী। এক সময়ে কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। তিনশত বছর পূর্বে কলকাতার পত্তন হয়েছিল। একথা নিয়ে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক আমাদের মনে থাকলেও ঐ সময়কে ধরে নিয়েই মোটামুটি ভাবে এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি অবতারণা করতে হবে।

কলকাতা তখন বর্তমানের মত জমকাল ছিল না। এর বিভিন্ন স্থান জলাভূমি, ঝোপ-জঙ্গল, খাল ও বিলে ভরা ছিল। এক কথায় বলা যায় পরিবেশটা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এই শহরের কলেবর বেড়েছে। গড়ে উঠেছে কাঁচাবাড়ী, পাকাবাড়ী, আদালত, শিক্ষাকেন্দ্র, মন্দির, গীর্জা, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও আরও কতকিছু। পশ্চিমবাংলায় কোন নগণ্য রেলষ্টেশন বা বাসস্ট্যাণ্ড হতে কোন কোন গ্রামে পৌছোতে হলে এখনও সাত-আট কিলোমিটার হাঁটতে হয়। এযুগে আমরা যারা শহর বা উন্নত জনপদে বাস করি, তাঁরা যেমন ঐসব গণ্ডগ্রামের অবস্থা কল্পনা করতে পারি না সে যুগে কলকাতার অবস্থাও কল্পনা করা খুবই কষ্টকর ছিল।

একটা জায়গায় একটু পার্থক্য ছিল। নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় কলকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। জোব চার্ণক কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে আসার পূর্ব হতেই কলকাতার অস্তিত্ব ছিল তাতে সন্দেহ নাই। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট জোব চার্ণক কলকাতা শহরের পত্তন করেন একথা আজ ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কেউ কি ফাঁকা জায়গায় ব্যবসার কেন্দ্র, কুঠী বা শহর কিংবা নগরের পত্তন করেন? অর্থনৈতিক ভূগোল কখনই আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না। তাহলে বুঝতে হবে জোব চার্ণকের কলকাতা আগমনের সময়

কলকাতা একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না। গোবিন্দপুর ও সুতানটী নাম মুছে গেল। কলকাতা নামটিই থেকে গেল। অপেক্ষাকৃত সহজ নাম বলেই কলকাতা নামটা থেকে গেল—একথা ভাবাও হয়তো অন্যায় হবে না।

কলকাতা বহু পূর্ব হতেই ছিল। বিপ্রদাস রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে কলকাতা নামের উল্লেখ আছে। এই কাব্য ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চিৎপুর, কলকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা কলকাতা ও বেতোড় ছেড়ে কালীঘাটে পৌঁছেছিল। তাইতো কবি-কঙ্কন লিখেছেন, "ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।" ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও কলকাতার উল্লেখ আছে।

এ প্রসঙ্গে পুরাতন কাব্যে, নাটকে কালীঘাট সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কালীঘাট ও কলকাতাতো কাছাকাছি। তাই কালী-ঘাটের অস্তিত্ব কলকাতার অস্তিত্বই প্রমাণ করে।

পূরাণে আছে সতীর দেহ একান্নটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যে যে স্থানে ঐ খণ্ডগুলো পড়েছিল সেই সেই স্থানগুলো তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। 'পীঠমালা' নামক সংস্কৃত পুস্তক হতে একান্ন পীঠের তথ্য জানা যায়। "জনগণের বিশ্বাস, মূল নাম কলিকাতা বা ক্যালকাটা ছিল না; ছিল 'কালীক্ষেত্র'। কালীক্ষেত্র হইতে কালী-ক্ষেত—কালীকোটা এবং তাহার অপভ্রংশ 'ক্যালকাটা'। কাহারও কাহারও মতে শব্দটি কালীঘাট শব্দের অপভ্রংশ। কেহ কেহ মনে করেন, শব্দ দুইটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। আবার বহু খ্যাতনামা লেখক মনে করেন যে নগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত দেবী কালীর নাম হইতেই কলিকাতা নামটির উৎপত্তি হইয়াছে।" অতুলকৃষ্ণ রায়ের 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' হতে উপরোক্ত তথ্য পাওয়া যায়। 'নিগমকণ্ডোর' পীঠমালায় 'বহুলা' হতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত স্থানকে কালীক্ষেত্র বলা হয়েছে।

'বহুলা' হল বর্তমান বেহালা। এই স্থানকে ঐ পীঠমালায় ত্রিভুজা-

কৃতি বলা হয়েছে। উত্তরে চিৎপুর, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূর্বে লবণ হ্রদ ও পশ্চিমে হুগলী নদী পর্যন্ত স্থানটি ত্রিভুজাকৃতি ছিল। কালীক্ষেত্র হতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন কাহিনী ও কাব্যের বিষয় অন্ততঃ কিছু বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত হয় একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

অন্যদিকে ঐতিহাসিকরা যুক্তি দিয়ে দেখান যে কালীক্ষেত্র কথাটি বেশীদিনের পুরাতন নয়। সনাতনপন্থীরা নিজ নিজ ধর্মকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে হিন্দুধর্মের যখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা তখন অনুন্নত শ্রেণীর দেবী কালীকেও সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা দেবী বলে মেনে নেন। সপ্তম হতে নবম শতাব্দীর মধ্যে আদিশূর কনৌজ হতে ব্রাহ্মণদের এদেশে আনেন। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম ছিল বলেই তিনি একাজ করেন। আসলে তান্ত্রিক মতবাদ রোধ করবার উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাহ্মণদের আনেন। কিন্তু আদিশূরের সময়ে কালীক্ষেত্রের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বল্লালসেনের রাজত্বকাল দ্বাদশ শতাব্দী। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন হলায়ুধ। তাঁর রচিত পুস্তক 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' হতে জানা যায় তান্ত্রিক মতবাদ তখন জনপ্রিয় ছিল। ঐ সময়ে কালীপূজার প্রবর্তন হয়েছে কিনা সন্দেহ। হিন্দু রাজত্ব যখন শেষ প্রান্তে উপস্থিত তখন কালীক্ষেত্র যে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি তা খুবই স্পষ্ট। অতুলকৃষ্ণ রায় স্পষ্ট ভাবেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "কালীঘাটের দলিল দস্তাবেজে কোনও হিন্দুরাজার কোন সনদ্ বা দানপত্র বা সমসাময়িক কোন নাগরিকের দানপত্র নাই।"

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে পুরাণ হতে কলকাতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে কলকাতা জনবসতির উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়। জলাভূমি ছিল কলকাতা। ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে কলকাতা দু বর্গমাইল বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে পরিণত হয়। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও কলকাতার অসংখ্য পুকুর, ডোবা, নালা একথার সত্যতা প্রমাণ করে। লেকটাউন, সল্টলেক প্রভৃতি স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থাই প্রমাণ করে কলকাতা একসময়ে জলাভূমি ছিল।

এখন আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপার্বন করে থাকি।

প্রাকৃতিক শক্তির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ মানুষ ক্রমে ক্রমে এক-একজন দেবদেবীকে আশ্রয় করেছে। মনের ভয় ও ভীতিই সৃষ্টি করেছে এক-একজন দেবদেবীর। বল্লালসেনের পূর্ব হতেই দেবদেবীর পূজা ছিল। কিন্তু তা জনপ্রিয় ছিল না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরই ছিলেন হিন্দুদের আদি দেবতা।

জলাভূমি কলকাতা যখন ত্রিভুজাকৃতি ছিল তখন সেখানে স্থাপিত হল কালীমন্দির। কিভাবে দেবতা বা দেবীরূপে কালী অবতীর্ণ হলেন তা বলা শক্ত। তবে এই দেবী নিম্নশ্রেণীর মানুষের দেবী এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে অবহেলিত, ঘৃণিত নিম্নবর্ণের মানুষের সাথে ব্রাহ্মণেরাও কালীপূজায় মেতে ওঠেন। হিন্দু সমাজে আবির্ভূত হলেন কালী। দ্বাদশ শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীতে ও কাব্যে কালীক্ষেত্রের তাই পরিচয় মেলে। আর কালীক্ষেত্রই কলকাতার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

জোব চার্ণকের পূর্ব হতেই যখন কলকাতা ছিল তখন যে সমস্ত কিংবদন্তী কলকাতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সেগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক রকম গল্প শোনা যায়। কবি কঙ্কনের গ্রন্থে 'কিলকিলা' নামক গ্রামের উল্লেখ আছে। রাজা রাধাকান্ত দেবের মতে তা থেকেই 'কলিকাতা' নামের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকের মতে কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট হতে কলিকাতা নামের সৃষ্টি। কলিচূণ বিক্রয়ের কেন্দ্র বলেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি—অনেকের এটাও মত। জনৈক ওলন্দাজ পরিব্রাজক কলকাতায় এসে মরার মাথা দেখেন। মরার মাথাকে তাদের ভাষায় 'গলগথা' বলে। কথাটা রূপান্তরিত হয়ে কলিকাতা হয়েছে বলে লোকমুখে প্রচলিত আছে। ঘাস কাটা সম্পর্কে বিভিন্নরকম গল্প বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের প্রচার বিভাগ হতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা ভ্রমণে' নামক গ্রন্থ হতে জানা যায়—"একজন ইংরেজ জনৈক ঘেসেড়াকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি মনে করে, "ঘাস কবে কাটা হইয়াছে" সাহেব বুঝি এই কথাই

জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং উত্তর দেয় 'কালকাটা'। এই 'কালকাটা' হতেই ক্যালকাটা বা কলিকাতা হইয়াছে।" আবার অনেকের ধারণা 'কালিকট' কথাটা বিদেশীদের জানা ছিল। তাই কলিকাতা নামটাই বিদেশীরা গ্রহণ করেছিল।

উপরোক্ত কিংবদন্তীর মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিরাম ও আবুল ফজলের লেখার উপরই আমাদের বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেও কিংবদন্তীগুলোকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। বর্তমানে গ্রামগুলোর নাম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশ গ্রামের নাম দেবদেবীর নাম, নবাব ও বাদশাহের নাম, কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম, এমনকি গাছপালার নামানুসারে হয়েছে। বর্তমান কলকাতার বিধান-নগর, যাদবপুর, সন্তোষপুর, বিদ্যাসাগর কলোনী, বাঘাযতীন প্রভৃতি নাম হতে একথার প্রমাণ মেলে। কলকাতার বটতলা, তালতলা, পটলডাঙ্গা, বৌবাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, বৈঠকখানা, ডালহৌসী স্কোয়ার বা বিবাদী বাগের কাছে লালবাজার, রাধাবাজার প্রভৃতি নামের পিছনে যে কাহিনীগুলো রয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্যি। জামাইকে চিনতে না পেরে ডাকাত শ্বশুর জামাইকে যে স্থানে খুন করেছিল সেই স্থানের নাম জামাইমারি। রাজা কোনদিন হয়তো কোন স্থানে ভাত খেয়েছেন কোন কারণে। ঐ থেকেই ঐ স্থানের নাম রাজা ভাত খাও। চোখের সামনে এই নামগুলো আমরা দেখে আসছি। আর কিংবদন্তীগুলোও কলকাতার প্রাচীনত্বকে স্বীকার করে। একটা কিংবদন্তী গড়ে উঠতে বহুদিন লাগে বলেই একথা অতি সহজে বলা যায়।

কলকাতা সেযুগে কেন গড়ে উঠেছিল এবং এযুগেই কলকাতার বাড়-বাড়ন্ত হবার কারণ বিশ্লেষণ না করলে কলকাতার ইতিহাস পর্যালোচনা করা সহজ হবে না। অপরদিকে কলকাতাকে ভাল করে জানা যাবে না। অতীতের কলকাতার সাথে বর্তমানের কলকাতার বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য কলকাতার ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বে সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেক মুসলমান বাদশাহ যে হিন্দুদের অত্যাচার, নিপীড়ন করতেন না এমনও নয়।

মুসলমান নবাব বাদশাহের অত্যাচারে হিন্দুরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তদুপরি বর্গীয় হাঙ্গামায় বাংলার অত্যাচারিত মানুষেরা ক্রমে ক্রমে কলকাতায় এসে ভীড় করতে থাকেন। সে যুগের সমাজে এরা ভাবনা-চিন্তায়, বুদ্ধি ও কলা-কৌশলে অনেকটা অগ্রগামী ছিলেন সমাজের অন্যান্য অংশ হতে। বিশেষ করে কলকাতার নিকটবর্তী এলাকা হতেই বেশী করে মানুষ কলকাতায় ভীড় করেছেন। সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন-যাপনই তাদের লক্ষ্য ছিল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষ-ভাবে তাঁরা ইংরেজদের আগমনকে স্বাগত জানান। দেশ পরাধীন হোক তাতে ক্ষতি কি ? ধন সম্পদ করতে হবে, ব্যবসায়ে মুনাফা লুটতে হবে এবং ইংরেজদের কাছে বড় বড় চাকুরী নিতে হবে—এই ধ্যান-ধারণাই সেযুগে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজদের সেবা করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। সেই ঝোঁক দেশ স্বাধীন হবার পরেও সমানে চলছে।

বর্তমানেও আমরা মফঃস্বল হতে কলকাতায় ভীড় করছি। ভারতের অন্যান্য রাজ্য হতেও কলকাতায় মানুষ এসে ভীড় করছেন। কলকাতায় প্রতিমাসে পাঁচহাজার লোক ভারতের অন্যান্য রাজ্য হতে এসে রুজি-রোজগারের চেষ্টা করেন। এছাড়া কলকাতা সারা ভারতের মধ্যে নিরাপদ শহর, এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম কম। এত নিশ্চিন্তে আর কোথাও বাস করা যায় না। কলকাতার বিশেষ এই অবস্থাটা জোব চার্ণক আসার পূর্ব হতেই ছিল। তাই কলকাতার গুরুত্ব সেযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত শুধু বেড়েই চলেছে।

নতুন করে ভীড় করা লোকেদের নিয়ে কলকাতার এ যুগেও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। অপরদিকে সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেযুগে কলকাতার বাড়-বাড়ন্তটাই বেশী ছিল। সেযুগে সমস্যা কম ছিল। আর সমস্যা থাকলেও তা নিয়ে মাথা খারাপ করার মত মানসিকতা তখনকার মানুষদের ছিল না।

জোব চার্ণক কলকাতায় আসার পূর্বে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-গুলো কলকাতা হতে উন্নত ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন স্থানের গুরুত্ব তখন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আবার বিভিন্ন কারণের ফলে ঐ স্থানগুলোর গুরুত্ব কমতে থাকে। কিন্তু কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে সপ্তগ্রাম ছিল বিখ্যাত বন্দর। সুপ্রাচীন-কাল থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সপ্তগ্রাম এশিয়ার অন্যতম কর্মবহুল ও ব্যস্ত বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। ষোল ও সতের শতকে সরস্বতীর প্রবাহের ধারা পরিবর্তনের সূচনা হয়। ফলে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমতে থাকে। প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে সরস্বতীর নাব্যতা কমে যায়। বড় বড় জাহাজের পক্ষে সরস্বতীর পথে সপ্তগ্রাম যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নতুন বন্দর গড়া অনুভূত হয়। বাংলায় তখন পর্তুগীজরা সবেমাত্র এসেছে। গর্তুগীজ বণিকেরা সেই সুযোগে সপ্তগ্রামের পাশে ভাগিরথীর তীরে নতুন বন্দর গড়ে তুলতে থাকেন। ১৫১৮তে বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ নাবিক ডি সালভার নেতৃত্বে লুঠতরাজ শুরু হয়। এদের অধিকাংশই ছিল জলদস্যু। বঙ্গোপসাগরের মুখেই এরা লুঠতরাজ সীমাবদ্ধ রাখত। ১৫২৬ এর পরে চট্টগ্রামে এদের প্রধান ঘাঁটি হয়। একদল পর্তুগীজ নাবিক ১৫৩৬-এ সরস্বতী দিয়ে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হল। গৌড়ের মামুদ শাহকে শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগীজ নাবিকরা সাহায্য করার ফলেই তারা বাংলায় বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল। সপ্তগ্রাম হতে কিছু দূরে তারা কুঠী তৈরী করে। কয়েক-বছরের মধ্যেই সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ উপনিবেশ তৈরী হয়ে যায়। ১৫৫৭-তে এদের ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩৫ জন এবং ৩০ হতে ৩৫টি জাহাজে এদের মালপত্র রপ্তানী হত। সরস্বতীর প্রবাহ কমায় ও ভাগিরথীর প্রবাহ বাড়ায় এরা সপ্তগ্রাম থেকে দূরে ভাগিরথীর তীরে বাণিজ্যকুঠী তৈরী করে। এভাবেই হুগলী বন্দরের পত্তন হয়। সময়টা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বর্তমানে সরস্বতী নদী মজে গেছে। এই অবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব হতেই শুরু হয়। আজও এই পরিবর্তন চলছে। হুগলী জেলার ত্রিবেণী শহরের পূর্ব হতে হাওড়া জেলার বেতোড় পর্যন্ত এই নদীর গতিপথ হলেও বর্তমানে বর্ষাকালে এই নদীর অবস্থা ডি ভি সি'র প্রধান খাল থেকেও চওড়ায় ছোট। গ্রীষ্মকালে ধানের জমির নালা হতে যতটা

জল প্রবাহিত হয় তার চেয়েও অনেক কম জল প্রবাহিত হয়। চাষীরা সরস্বতীর খাতে ধানের বীজ লাগায় ; তরিতরকারীর চাষ করে। অতীতে সরস্বতীর অবস্থা এরূপ ছিল না তা পূর্বেই বলা হয়েছে। সমস্ত স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে ভাগিরথীর দিকে। ফলে ভাগিরথী চওড়া হতে থাকে। অন্যদিকে ভাগিরথীর পূর্বতীরের উপনদীগুলির অবস্থাও খারাপ হতে থাকে। সরস্বতী মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক গুরুত্ব কমতে থাকে বলেই ভাগিরথীর উত্তরদিকে নতুন বসতি গড়ে উঠতে থাকে। এই স্থানের নাম বেতোড়। ভাগিরথী ও সরস্বতীর সংগমস্থলে এই স্থান। সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই এ অঞ্চলে আসতে থাকেন। চাষী, জেলে, ছোট জাতের লোকেদের সাথে সাথে উচ্চবর্ণের মানুষেরাও এলেন। প্রতাপাদিত্য মারা গেছেন। তার সৈন্যবাহিনী বেকার। এখানে ১৫৯৯ তে পর্তুগীজরা ও আর্মেনিয়ানরা গীর্জা তৈরী করে। ১৫৩০ হতে ১৫৬০ পর্যন্ত পর্তুগীজদের বাণিজ্যতরী বেতোড়ে নোঙ্গর করত। এ কারণেই টালায় তাদের দুর্গ তৈরী হয়েছিল। বারোল সাহেব ১৫৪০-এ যে মানচিত্র বের করেন তাতে বেতোড়ের নাম ছিল। এ ঘটনা হতেই ঐ সময়ের বেতোড়ের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনুমান করা যায়। কলকাতার মেটিয়াবুরুজের অপরপ্রান্তে বেতোড় এখনও বর্তমান। বেতোড় বর্তমানে বাঁটরা বলে পরিচিত।

বর্তমানে বাঁশবেড়িয়া ও কল্যাণীর মধ্যে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মিত হয়েছে। এখানে একটা চর জেগেছে। বর্তমানে এখানে চাষাবাদ হচ্ছে। দু-একটা ঘরও দেখা যায়। কল্যাণীর পাশেই হালিশহর। সপ্তদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের কাছে হালিশহরে নতুন চর জাগলো। বর্তমানে যেস্থানে কাটোয়া-হাওড়া রেললাইন অবস্থিত তার বহু পশ্চিমে যে গঙ্গার প্রবাহ ছিল একথা এই তথ্য হতে সহজেই বোঝা যায়। বর্তমানের চরটার ভিত্তি সে যুগ থেকেই যে সুরু হয়নি তাই বা কে বলতে পারে ?

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার হিজলী ঐ যুগে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কাঁথি সহরের অন্তর্গত রসুলপুর নদীর তীরে অবস্থিত হিজলী সে সময় বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল। রালফ্ থিচ নামক জনৈক ঐতিহাসিক,

পর্যটক ও ভূতত্ত্ববিদদের বিবরণ হতে জানা যায় যে ঐ সময় পূর্ব এশিয়ায় হিজলী বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর বলে পরিচিত ছিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই এখানে প্রথম এসেছিল। এখানে তাদের গীর্জা ও কুঠী তৈরী হয়। পরে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা এখানে আসে। মগ দস্যুদের অত্যাচার এ সময় খুবই ছিল। শাহজাহান হিজলীসহ দক্ষিণবঙ্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। 'সরবোলা' নামে একদল প্রহরী দ্বারা তিনি শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

এবার সপ্তগ্রামের কথায় আসা যাক। ১৬২৮-২৯-এর মনরিথের বিবরণ থেকে জানা যায় বোর্ণিও, মালাক্কা হতে মূল্যবান দ্রব্যাদি পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে এনে থাকে একথা শুনে আকবর দুজন পর্তুগীজকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। সপ্তগ্রাম হতে দুজন পর্তুগীজকে ঢাকার নবাব দিল্লীতে যাবার নির্দেশ দেন। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ পেট্রোটাভার্স সপ্তগ্রামে পর্তুগীজদের দলনেতা ছিলেন। ১৫৭৮-এ তিনি ফতেপুরে মোগল বাদশাহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহে সপ্তগ্রাম থেকে পর্তুগীজরা হুগলীতে নিজেদের কুঠী স্থানান্তরিত করেন। বাংলার শাসকশ্রেণীকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যেই বিদেশী শক্তিকে মদত দেন মোগলরা। ১৬৩৪-এ শাহজাহান হুগলী বন্দর দখল করেন এবং ঐ সময় হতেই তা বন্দরের মর্যাদা লাভ করে।

দশম শতাব্দীতে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের আমলে সপ্তগ্রাম রাজধানী ছিল। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম দখল করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাংলার তিনটি প্রধান শাসনকেন্দ্রের একটির নাম ছিল সপ্তগ্রাম। ১৩৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পর্যটক ইবনবতুতা সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। ১৫৩০-৪০-এ লিখিত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। এছাড়া ১৫৭৪-১৬০৪-এ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। সপ্তগ্রাম তখন উন্নতির চরমশিখরে, চণ্ডীমঙ্গলে তাই আমরা পাই—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়,
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।

এছাড়া কৃষরামের ষষ্ঠীমঙ্গলে আছে—

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল,
চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথী কুল।

এহেন সপ্তগ্রাম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগিরথীর গতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমলো। রমরমা হয়ে উঠল হুগলী বন্দর।

রাণী ১ম এলিজাবেথের সনদ লাভ করে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরী করেন। ১৬০৮-এ প্রথম জেমসের পরামর্শদাতা হকিংস জাহাঙ্গীরের দরবারে বাণিজ্যের প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। স্যার টমাস রো প্রথম জেমসের সুপারিশে ১৬১৫-তে ভারতে আসেন এবং বাণিজ্য করার সুযোগ পান। পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতে বাণিজ্য করতে আসেন। তাদের বিরোধীতায় হকিন্স সুরাটে কুঠী স্থাপনে ব্যর্থ হন। শেষ পর্য্যন্ত পর্তুগীজদের পরাজিত করে কোম্পানী সুরাটে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে। ১৬১৫-তে সম্রাটের এক ফরম্যান মারফৎ ইংরেজরা সুরাটে কুঠী নির্মাণ করার অধিকার পেয়েছিল। ওদিকে প্রথম জেম্সের পর ইংলণ্ডের রাজা হলেন দ্বিতীয় চার্লস। বিবাহসূত্রে পর্তুগালের কাছ হতে তিনি বোম্বাই লাভ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিনি তা বিক্রয় করেন। এভাবে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। 'সিয়েলেস' নামক জাহাজে ১৬৫০-এ কোম্পানীর লোকেরা মাদ্রাজ উপকূলে পৌছালে মাদ্রাজের কর্মকর্তারা জাহাজটিকে বালেশ্বরে পাঠিয়ে দেন। তারা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসনকর্তা শাহ সুজার কাছ থেকে বছরে তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাণিজ্য করার অনুমতি পায় এবং হুগলীতে কুঠী তৈরী করে। হুগলীতে পূর্ব হতেই পর্তুগীজদের ও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের বাণিজ্য কুঠী ছিল। ইংরেজরা ১৬৫৫-তে বিজম্যান হ্যাভেনের পরামর্শে হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করে। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের মূল শিকড় এই বছরই প্রোথিত হয়েছিল।

ইংরেজ ডাক্তার গ্যাব্রিয়াল ব্রাউটন শাহসুজার অসুস্থ স্ত্রীকে রোগ-

মুক্ত করেন। চিকিৎসার মজুরী বাবদ ব্রাউটন বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন। অনেকের মতে সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারার চিকিৎসা করে ব্রাউটন এই অধিকার লাভ করেন। ঐ সময় সুরাটে ব্রাউটন নামে এক চিকিৎসক ছিলেন। এ ঘটনার কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও একথা স্পষ্টই জানা যায় যে শাহসুজার সাথে ব্রাউটনের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর সঙ্গীরূপে তিনি রাজমহলে ছিলেন। তাই বাংলার বিভিন্ন স্থানে কুঠী নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অনুমতি পেতে ইংরেজদের কোনরকম বেগ পেতে হয়নি।

রাজনারায়ণের 'কলকাতা' হতে শাহজাহানের অগ্নিদগ্ধ কন্যার চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভের ঘটনা জানা যায়। আগ্রায় ব্রাউটনের সাথে শাহসুজার আলাপ ছিল। পরে বাংলায় নবাব হবার পর ব্রাউটনের সাথে হৃদ্যতা থাকা স্বাভাবিক। এদিকে মাদ্রাজে ইংরেজদের ব্যবসা ভাল জমেনি। বাজার ছিল ভয়ানক মন্দা। বালেশ্বর ইংরেজদের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয়। এখানকার পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। এছাড়া পর্তুগীজদের উপদ্রবের ভয়ও ছিল। এ সময় ইংরেজদের দু জাহাজ মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। লাভ করাতো দূরের কথা ক্ষতিই হল বেশী। ইতিমধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করার যে অধিকার পেয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এনিয়েও কোম্পানীর ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে ১৬৫৭তে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নতুন চার্টার পেল। উড়িষ্যা ও হুগলী ইংরেজদের বেশী পছন্দ। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার বালেশ্বরও ভাল লাগলো না। এখানে পর্তুগীজদের উপদ্রব ছিল। ইংরেজরা হুগলীকে অনেক নিরাপদ মনে করেন। হুগলীর কুঠীকে ভাল করে তৈরী করার দিকে ইংরেজদের নজর পড়ে। তাই ১৬৫৮ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী জর্জ গর্টন হুগলীর কুঠীর প্রধান হবার পরেই সমস্ত দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করেন।

কোম্পানী বাণিজ্যের নতুন চার্টার পেলেও সমস্যা থেকেই গেল। কোম্পানীর কর্মচারীরা গোপনে ব্যবসা করে ব্যক্তিগত মুনাফা লুঠতেন। তাই ব্যবসা গোটাবার প্রশ্নও এসে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন চার্টার তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করল। কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে

কঠোর ব্যবস্থা হল। কুঠীর দায়িত্বে যিনি থাকবেন তাকে প্রত্যহ ডাইরী লিখতে হবে, কর্মচারীদের বেতন গ্রহণের সময় জামীন নামায় সই করতে হবে—ইত্যাদি নানারকম শর্ত। কুঠীগুলির দায়িত্বে কে কে থাকবেন তাও ঠিক হল বিলেত হতে। এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

এদিকে ভারতের অস্থির পরিস্থিতি ইংরেজদের সুযোগ-সুবিধা এনে দেয়। শাহাজাহানের অসুস্থতার সুযোগে সিংহাসন নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি। ১৬৫৮তে আওরঙ্গজেব আলমগীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর ভাইদের কেউ কেউ খুন হন। কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। এদিকে বাংলার শাসনকর্তা শাহসুজা মারা যাওয়ায় নতুন শাসনকর্তা হন মীরজুমলা। ফলে শাহসুজার সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা বাতিল হবার উপক্রম। হুগলীর প্রধান এই প্রশ্ন তোলেন। ভারতের অন্যান্য কুঠীর প্রধানদের মনেও এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়।

বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাবার কৌশল করলে কোম্পানীর সাথে আওরঙ্গজেবের বিবাদ আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর সাথে আওরঙ্গজেবের বিবাদের অবসানও হয়। কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করবার সুযোগ লাভ করল। অন্যদিকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নতুন সমস্যা দেখা দিল। জলপথে বোম্বেটে দস্যুদের উৎপাত কোম্পানীকে বিপদে ফেলতে থাকে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীগুলির প্রশাসনিক অবস্থা এ সময় উন্নত ধরণের। হুগলীতে জর্জ গর্টন, বালেশ্বরে হপকিন্‌স্‌, কাশিম বাজারে কেন, পাটনায় চেম্বারলেন অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রত্যেকেই কোম্পানীর দুর্দিনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে মীরজুমলা পাটনা থেকে আসা ইংরেজদের নৌকাগুলি রাজমহলে দখল করেন। ইংরেজরা এই আক্রমণ প্রতিহত করে নৌকাগুলি দখল করে নিল। মীরজুমলার সাথে এভাবেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। মীরজুমলা কুঠীর অধ্যক্ষকে কড়া চিঠি পাঠান। মহাজনী নৌকাগুলিও ইংরেজরা দখল করেছিল। যদি মহাজনী নৌকা ছেড়ে না দেওয়া হয় তাহলে হুগলী হতে কোম্পানীকে বিদায় নিতে হবে চিরতরে এই ছিল মীরজুমলার নির্দেশ। কোম্পানীর হেড কোয়াটার

তখন মাদ্রাজ। পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ মাদ্রাজে এ সম্পর্কে জানান। মাদ্রাজের অধ্যক্ষ পাটনার অধ্যক্ষ ট্রিভিয়াকে বিবাদ মেটাতে নির্দেশ দেন। ক্ষমা প্রার্থনা করেই মীরজুমলার সাথে কোম্পানীর বিবাদের অবসান ঘটে। অবশ্য দখল করা বাড়তি মহাজনী নৌকাগুলি ফেরৎ দিতে হয়েছিল।

ভাগ্য ইংরেজদের সুপ্রসন্ন ছিল। কুচবিহার ও আসাম সীমান্তে তখন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। মীরজুমলা এতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে ইংরেজদের সুবিধাই হল। শায়েস্তা খাঁ ইতিমধ্যে বাংলার প্রধান হলেন। শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কড়া লোক। মগ-পর্তুগীজ দস্যুদের নিয়ে প্রথম দিকে ব্যস্ত থাকার ফলে ইংরেজদের দিকে প্রথমে নজর দিতে পারেন নি। এবার ইংরেজদের দিকে নজর দেন। তিনি ১৬৭২-এ ইংরেজদের বাণিজ্য স্বত্বকে স্বীকার করে নিয়ে এক আদেশপত্র জারী করেন। ফলে ইংরেজরা বালেশ্বর, পাটনা, কাশিমবাজার ও হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাধীনভাবে করবার সুযোগ লাভ করেন। ইংরেজদের কোন সমস্যা থাকল না। নিজেদের সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল।

বিলেত হতে ষ্ট্রিন শ্যাম মাষ্টারকে পাঠান হল। ১৬৭৬-এর ৮ই জানুয়ারী বিলেত হতে তিনি যাত্রা করেন ভারতের দিকে। সাতমাস পরে মাদ্রাজে তিনি আসেন। প্রত্যেক কুঠীতে কড়া নির্দেশ জারী করে আবার মাদ্রাজে ফিবে যান। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে বিবাদ সে সময় চরমে উঠেছিল। মাদ্রাজ, বালেশ্বর, বেতোড়, চন্দননগর ও কাশিমবাজারে রঘু পোদ্দার নামক এক ব্যক্তি খাজাঞ্চী পদে কোম্পানীর অধীনে কাজ করতেন। কোম্পানী রঘু পোদ্দারের কাছে টাকা ধার নিত। ভিনসেণ্ট তখন কোম্পানীর প্রধান। তিনি অনন্তরায়ের উপর কুঠীর দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে অন্যত্র যান। এ সময়ে অনন্ত-রায়ের প্রহারে রঘু পোদ্দারের মৃত্যু হয়। রঘু পোদ্দারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোম্পানীর কর্মচারীরা দুভাগ হয়ে যান। কেউ ঘটনাকে সমর্থন করলেন। কেউ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এ ঘটনা কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে অনৈক্য কতদূর গিয়েছিল তা বোঝবার জন্যই উল্লেখ

করা হল। যাইহোক, তিন বছর পর শ্যাম মাষ্টার পুনরায় বাংলায় ফিরে এসে দেখেন ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

কাশিম বাজারের কুঠীর গুরুত্ব সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হতে যথেষ্ট লাভ করে। ১৬৫৮-তে কেন্ সাহেব কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এ সময়ে ইতিহাসের বিতর্কিত পুরুষ জোব চার্ণক মাত্র কুড়ি পাউণ্ড বেতনের একজন কর্মচারী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে চার্ণকের উন্নতি হতে থাকে। কোম্পানী তাঁকে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করেন। তাঁকে কাশিমবাজার হতে মাদ্রাজে বদলি করা হল। তিনি বেপরোয়া ছিলেন। তাই আদেশ মানলেন না। শেষ পর্যন্ত অবাধ্য চার্ণককে হুগলীতে বদলি করা হল। বাংলার কুঠীর উপর মাদ্রাজের দায়িত্ব থাকলো না—স্বয়ংসম্পূর্ণ কুঠীতে পরিণত হল কলকাতা। বাংলার কুঠীর প্রথম গভর্ণর হলেন হেজেস্। তিনি ১৬৮২-এর ২৮শে জানুয়ারী ডিকেন্স নামক জাহাজে চেপে বিলেত থেকে বাংলার দিকে রওনা হন।

হেজেস কড়া লোক ছিলেন। তিনি ভিনসেণ্টকে বহু কষ্টে সামলাতে পারলেও পিটের সাথে কৌশলে ব্যর্থ হন। হেজেস ভিনসেণ্টকে এক সময় বন্দী করেছিলেন এরকম তথ্যও পাওয়া যায়। আবার এ তথ্যও জানা যায় যে ভিনসেণ্ট নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই হেজেস হুগলীতে পৌঁছানমাত্র ভিনসেণ্ট ডাচদের বাগানে বিপুল আড়ম্বরের সাথে হেজেসকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। হেজেস এখানে কোম্পানীর কাগজপত্র দেখেন এবং শেষ পর্যন্ত ভিনসেণ্টকে বন্দী করেন। হেজেসের প্রতিদ্বন্দ্বী পিট আরও বেশী কৌশলী ছিলেন। পিট হেজেস পৌঁছাবার এগার দিন পূর্বে বালেশ্বরে পৌছান। তিনি ইণ্টারলোপারদের নেতা ছিলেন। বালেশ্বরে পিট নিজেকে কোম্পানীর প্রকৃত প্রতিনিধি বলে প্রচার করেন। পিটের হাতেই সব লোকজন। কে কার কথা শোনে? দুটি আলাদা স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে কোম্পানীর কাজকর্ম।

এ সময় বালচন্দ্র নামক এক মোগল কর্মচারীর হাতেই ছিল পারমিট দেবার ক্ষমতা। এই বালচন্দ্র পিটের হাতের লোক ছিলেন। এমত

অবস্থায় হেজেসের করার কিছুই নাই। পিট নিজেকে কুঠীর প্রধান বলে ঘোষণা করেন। বালচন্দ্র পিটের হয়ে ওকালতি করতে থাকেন। তিনি বলেন, পুরানো কোম্পানীর লোকের চেয়ে নতুন কোম্পানীর লোকজনই ভাল। হেজেসের কাছে ফরম্যান থাকলেও ঠিকমত পাওনা যখন মিলছে তখন কে পুরানো, কে নতুন তা নিয়ে আমাদের ভেবে লাভ কি? বাংলার নবাব কিন্তু অন্যপথে চলেন। নতুন কোম্পানীকে হঠাতে তিনি তৈরী হন। মোগল বাদ্‌শাহের সৈন্যরা পিটের অনুগামী হওয়ায় বিবাদ দেখা দিল। শায়েস্তা খাঁ ইতিমধ্যে নবাব হয়েছেন বাংলায়। তিনি নীরব। হেজেস তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবু হেজেস চেষ্টা চালিয়ে যান।

পরমেশ্বর দাস ঐ সময় বাংলার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। হেজেস বজরায় করে শায়েস্তা খাঁর সাথে দেখা করতে ঢাকার পথে রওনা হয়েছেন। পরমেশ্বর বজরা আক্রমণ করেন। ভাগিরথীর পথ বাদ দিয়ে হেজেস সুন্দরবনের পথ দিয়ে ঢাকা পৌঁছান। হেজেসের সাথে শায়েস্তা খাঁর দেখা হলো না। ইতিমধ্যে শায়েস্তা খাঁ লালবাগে চলে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত দেড়মাস অপেক্ষা করার পর হেজেস শায়েস্তা খাঁর সাথে দেখা করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বলেন। শায়েস্তা খাঁ হেজেসকে সবকিছু প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন।

হেজেস ভাবলেন জোব চার্ণকের সাথে একবার দেখা করা প্রয়োজন। কিন্তু চার্ণকও যে তাঁর বিরুদ্ধে একথা তিনি জানতেন না। হেজেসের কাউন্সিলে ঐ সময়ে জোব চার্ণক, জন বেয়ার্ড, ফ্রান্সিস এলিশ, জোসেফ উড, উইলিয়াম জনসন সদস্য। জনসন হেজেসের গুপ্তচরের কাজ করতেন। ফ্রান্সিস এলিসের বিরুদ্ধে জনসন হেজেসকে ইতিমধ্যেই নানা প্রকার নালিশ জানিয়েছেন। যার ফলে এলিস পদচ্যুত হন। তারপর হেজেসের রাগ পড়ল চার্ণকের উপর। লালবাগে থাকাকালীন হেজেস চার্ণকের মনোভাব বুঝেছিলেন। কিন্তু এলিসের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় চার্ণককে শায়েস্তা করতে পারেন নি। তাই হেজেস কাশিম-বাজারে পুনরায় যান। উদ্দেশ্য চার্ণককে শায়েস্তা করতে হবে। এ সময় কাশিমবাজারের কুঠীর ওয়াটসনের সাথে হেজেসের গোলমাল

বাধে। রঘু পোদ্দারকে যে অনন্ত রায় খুন করেছিল সেই অনন্ত রায় চার্ণকের বন্ধু ছিলেন। তাই বেপরোয়া চার্ণক আরও অবাধ্য হন। হেজেসের চার্ণকের উপর প্রতিশোধ নেবার কোন ক্ষমতাই থাকল না।

এবার চার্ণকের ভাগ্যদেবী আরও সুপ্রসন্ন হল। ১৬৮৪তে জুলাই মাসের এই হৌ সাহেব এসে হেজেসের পদচ্যুতির খবর দেন। বাংলার কুঠীর গভর্ণর হলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য বেয়ার্ড। বেয়ার্ডের দুর্গ তৈরী করার ইচ্ছা হলেও উপযুক্ত স্থান খুঁজে পেলেন না। মোগল সাম্রাজ্যের দোদুল্যমানতা কেটে গেছে। পর্তুগীজদের সবলতা কমেনি, বরং বেড়েছে। মাদ্রাজ হতে এ সময় শায়েস্তা খাঁকে চিঠি দেন অধ্যক্ষ। এই চিঠিতে বাংলা হতে ব্যবসা গুটিয়ে নেবার কথাই ছিল। নবাব ভাবেন এতে রাজস্বের ক্ষতি হবে। তাই নবাব চাননি ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে। এ সময়ে ইংরেজরা ব্যবসা গুটিয়ে নিলে ভারতের রাজনীতি হয়তো অন্য খাতে প্রবাহিত হত। এমন সময় হুগলীর চীফ্ এজেন্ট মারা যান। চার্ণক কাশিমবাজার হতে হুগলীতে বদলী হন। এটা ১৬৮৫-এর ঘটনা।

কাশিমবাজারে বদলী হলেও চার্ণকের কাশিমবাজার ছাড়া সম্ভব হল না। নানারকম দুর্নীতিতে তিনি জড়িয়ে পড়েন। দেনাপাওনার ব্যাপারে দেশীয় মহাজনদের সাথে তাঁর গোলমাল ছিল। মোগল শাসনকর্তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নন। পালিয়ে যাবার ভয়ে চার্ণককে নজর বন্দী করে রাখেন পাওনাদাররা। শেষ পর্যন্ত সবার চোখে ধুলো দিয়ে ১ ৮৬-এর এপ্রিলে চার্ণক হুগলীতে পালিয়ে আসেন। পালিয়ে এসেও চার্ণকের নিস্তার নেই। মোগলদের সাথে তাঁর বণিবনা হল না। হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে চার্ণকের বিবাদ আরম্ভ হয়। মোগল সৈন্য হুগলীতে জড় হতে থাকে। ইংরেজ সৈন্যও জড় হল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবরের যুদ্ধে মোগলদের জয় হল। কয়েক দিনের মধ্যে আবার দুদলে যুদ্ধ হল। এবার ইংরেজদের জয় হল। চন্দননগর হতে ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে জড় করা হল; চার্ণক রিচার্ডসনকে তোপখানা আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর মনে দ্বিধা। তাই এগিয়ে গিয়েও রিচার্ডসন পিছিয়ে যান। কিন্তু চন্দননগরের ক্যাপ্টেন আরবথনট

বাণিজ্য তরী

মোগল সৈন্যদের পরাজিত করেন। ইংরেজরা তোপখানা দখল করল। ফৌজদার আবদুল গণি নৌকায় করে পালিয়ে যান। ভয় পেলেন হুগলীর মোগল শাসনকর্তা। তিনি চার্ণককে যুদ্ধ থামাবার চিঠি দেন। যুদ্ধ বন্ধ হল। চার্ণক হিজলীর শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। মোগলদের ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট হন। এদিকে শায়েস্তা খাঁর কানে হুগলীর খবর এল। তিনি ইংরেজদের যুদ্ধ করার নীতি বুঝতে পারেন। শায়েস্তা খাঁর নির্দেশে ঢাকা ও পাটনায় ইংরেজদের উপর অত্যাচার শুরু হল।

১৬৮৬-এর শেষ দিক। চার্ণক হুগলীতে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। বালেশ্বর যাওয়া স্থির করেন চার্ণক। কিন্তু যেতে যেতে বনে-জঙ্গলে পূর্ণ সুতানটী গ্রামটা তাঁর নজরে আসে। এখানে তিনি একটা হাটও দেখতে পান। রাধারমণ মিত্রের "কলিকাতা সেকালের ও একালের" গ্রন্থ হতে জানা যায় যে চার্ণক ১৬৮৬তে সব গুটিয়ে যখন কলকাতায় আসেন তখন সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল চারশতের মত ইংরেজ ও পাঁচঘর বাঙালী। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। চার্ণক দুমাস সুতানটীতে থাকলেন এটুকুই যথেষ্ট। অন্য আলোচনা পরেই হবে।

শায়েস্তা খাঁ বালেশ্বরে গেলেন না। সৈন্য নিয়ে তিনি হুগলীতে এলেন। চার্ণক শায়েস্তা খাঁর সাথে মীমাংসার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। চার্ণক দমবার পাত্র নন। এদেশের কিছু লোককে হাত করাই ছিল সব সময়ে ইংরেজদের কৌশল। ভারতে বাণিজ্য করবার সময়, ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় এমনকি ভারত হতে চিরদিনের জন্য চলে যাবার সময়ে এদেশের কোন কোন লোককে বা নেতাকে হাত করে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। ভরমল নামক জনৈক মহাজনের সাথে ইংরেজদের ভাব ছিল। শেষ পর্যন্ত ঢাকা হতে শায়েস্তা খাঁর দূতরূপে এলেন ভরমল। চার্ণক বন্ধু ভরমলকে দেখে অবাক হন। বার বার অনুরোধ করেও চার্ণক যেখানে মীমাংসা করতে পারেন নি সেক্ষেত্রে সন্ধিপত্র নবাবের কাছ হতে দ্বারে উপস্থিত ভরমলের মারফৎ। এতে অবাক না হয়ে পারেন নি চার্ণক। আসলে সরকারের

নীতি বরাবরই ব্যবসায়ী, মহাজন ও বিত্তবানদের নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ জিনিস সে সময়েও ঘটেছে, এখনও স্বাধীন ভারতে ঘটছে।

নবাবের সাথে ইংরেজদের বারদফা চুক্তি হল ঃ—(১) ইংরেজরা নবাবের এলাকায় একটা কেল্লা তৈরী করবে। (২) মালদহের কারখানা লুঠ করায় ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে তা ফেরৎ দিতে হবে। (৩) ইংরেজরা নিজেরাই টাঁকশাল বসাবে। (৪) প্রজাদের সাথে বাণিজ্য-সংক্রান্ত লেনদেন ইংরেজরাই করবে। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী সন্ধিপত্র ঢাকায় পাঠান হল। নবাব ২৮শে জানুয়ারী সন্ধিপত্রে সই করে দিল্লী পাঠান। সন্ধিপত্র অনুমোদন করেননি দিল্লীর সম্রাট। মাসখানেক পর তা ফেরৎ এল। শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের উচ্ছেদের আদেশ দেন। তাই চার্ণককে সূতানটী ছাড়তে হল।

সূতানটী হতে চার্ণক রওনা হলেন। পথে বাদশাহী নিমক মহল ও থানা দুর্গ। নিমক মহলে আগুন লাগিয়ে থানা দুর্গ অতি সহজেই চার্ণক দখল করেন। নিকলসন গেলেন হিজলী দখল করতে। মালেক কাশেম তখন হিজলীর শাসনকর্তা। বিনাযুদ্ধে দখল হল মোগলদের কামান, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র। ঐ বছরই ফেব্রুয়ারীতে হিজলীতে এলেন চার্ণক। আশার কি আর শেষ আছে? বালেশ্বর দখলের বাসনা জাগে চার্ণকের মনে। চারটি হাতি ও বহুবিধ উপহার সামগ্রী নিয়ে দুখানা জাহাজ শায়েস্তা খাঁ ও শাহজাদাকে উপহার দেবার জন্য যাচ্ছিল, ইংরেজরা দখল করে নিল জাহাজ দুটি। বালেশ্বরের মানুষেরা ইংরেজদের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করল। চার্ণক আবার হিজলীতে ফেরেন। হিজলীর জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বহু সৈন্য মারা যায়। চার্ণক চিন্তিত হন। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকলেও শায়েস্তা খাঁকে বাংলার দায়িত্ব দেন। তাঁর কড়া নির্দেশ—যেভাবেই হোক ইংরেজদের হঠাতে হবে। তাই শায়েস্তা খাঁ উদ্যোগ নেন।

১৬৮৭-তে মে মাসের শেষের দিকে মোগল অশ্বারোহী সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্য রসুলপুর নদীর মোহনায় জড় হতে থাকে। সম্ভবতঃ

দিনটা ২৮শে মে। রসুলপুর নদী পার হয়ে হিজলীর দক্ষিণ দিকে সৈন্য সমাবেশ করা হল। হিজলী হতে পালিয়ে যাওয়া সেনাপতি মালিক কাশেমও মনোবল ইতিমধ্যে ফিরে পেয়েছেন। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে ইংরেজদের প্রতিরোধের জন্য তিনি তৈরী হন। ইংরেজদের জাহাজের উপর কামান দাগা হল। হিজলীতে মোগলরা করলো লুটপাট।

কোম্পানীর পক্ষে চার্ণক সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি বুঝলেন সোজাপথে বাঁচার আশা কম। তাই অন্য পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন চার্ণক। চার্ণকের ভাগ্য বরাবরই ভাল। ক্যাপ্টেন ডেনহ্যাম একটি জাহাজে বিলেত হতে মাত্র সাতাত্তর জন সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। এতে চার্ণকের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে চার্ণক দুর্গের সৈন্যদের গুপ্তপথে জাহাজ ঘাটায় পাঠাতে থাকেন এবং পায়ে হাঁটিয়ে প্রকাশ্য পথে তাদের দুর্গে নিয়ে আসেন। বার বার এরূপ করার ফলে নবাব সৈন্যের ধারণা হল যে বিলেত হতে অনেক সৈন্য এসেছে। দুদলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল। চার্ণকের কৌশলে নবাব সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলায় মোগল বাহিনীকে পরাজিত করতে চার্ণকের বেগ পেতে হল না।

সন্ধি হল দুপক্ষের মধ্যে। উলবেড়িয়া পর্যন্ত যাতায়াতের অধিকার লাভ করেন চার্ণক। দলবল নিয়ে চার্ণক হিজলী ত্যাগ করে উলবেরিয়ায় আসেন। এ সময়টা ছিল জুন মাস। সন্ধিপত্র ঢাকায় পাঠান হল। নবাব সন্ধিপত্র পাঠান দিল্লীতে। সম্রাট চার্ণককে উলবেরিয়ায় থাকতে নির্দেশ পাঠান। সম্রাটের আরও নির্দেশ ছিল—ইংরেজদের দাবী যথাসময়ে বিবেচনা করা হবে। চার্ণক সম্রাটের আদেশপত্র ফেরৎ পাঠান। উলবেরিয়ায় চার্ণক থাকা ঠিক মনে করলেন না। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চার্ণক দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেন।

চার্ণকের দ্বিতীয়বার কলকাতা আগমনের সময় নিয়ে আমাদের মনে অনেক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

পূর্ণেন্দু পত্রীর "জোব চার্ণকের কলকাতা"-র ৭২ পৃষ্ঠায় চার্ণকের দ্বিতীয়বার কলকাতা আগমনের সময় সম্পর্কে ১৬৮৭-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসকে সমর্থন করা হয়েছে। রেলওয়ে দপ্তরের পুস্তক অনুযায়ী

চার্ণক দ্বিতীয়বার কলকাতা আসেন ১৬৮৭তে। ঐতিহাসিক ডঃ কিরণ চৌধুরী তাঁর রচিত বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তকে লিখেছেন, "হুগলী হইতে ইংরেজদিগকে মুঘল সৈন্য বিতারিত করিলে জব চার্ণকের চেষ্টায় ইংরেজদিগকে ক্ষমা করা হইল। ১৬৮৭ সালে ইংরেজগণ (শোভাবাজার) সূতানটীতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পাইল।" রেলওয়ে বোর্ডের পুস্তক হতে আরও জানা যায়, ১৬৮৬তে চার্ণক হুগলী ফিরে যান। কাশিমবাজার হতে চার্ণক ১৬৮৬তে হুগলী আসেন। সম্ভবতঃ রেলওয়ে বোর্ডের পুস্তকে এই তথ্যকেই ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। জোব চার্ণককে নিয়ে দীর্ঘদীন ধরে আমাদের যে ধ্যান-ধারণা তাঁর বিরুদ্ধে যিনি প্রথম কলম ধরেছেন তাঁর তথ্যকে যেমন উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি অন্যান্যদের মতামতকে খণ্ডন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু বাস্তবকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে ১৬৮৭তেই চার্ণকি দ্বিতীয়বার কলকাতা আসেন।

কাশিমবাজারে থাকাকালীন চার্ণককে মাদ্রাজে বদলী করা হল। চার্ণক অবাধ্য হলেন। মাদ্রাজে গেলেন না। আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটলো। বিলেত হতে হিথ সাহেব চিঠি নিয়ে উপস্থিত। চার্ণককে হিথের সাথে চট্টগ্রাম যেতে হবে। চার্ণক সূতানুটী ছাড়তে অনিচ্ছুক। তবু তাঁকে যেতে হল। যাবার পথে ১৬৮৮-এর নভেম্বরে বালেশ্বর লুঠ করা হল। নবাবের সাথে সন্ধি হল। যে চার্ণক সূতানুটী ছাড়তে চাননি সেই চার্ণক চট্টগ্রাম দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। হিথকে নিয়ে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ চার্ণক মাদ্রাজ পৌঁছান। সেখান হতে ঐ বছরই ১৩ই ডিসেম্বর প্রত্যেকে জাহাজে করে চট্টগ্রাম রওনা হন। জাহাজ ১৬৯০-এর ১৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে পৌঁছাল। সুরক্ষিত চট্টগ্রামকে আক্রমণ করা গেল না। এদিকে সৈন্যরা রোগে আক্রান্ত হল। মাদ্রাজের দিকে জাহাজ ঘুরল। মাদ্রাজের জন চাইল্ড ছিলেন খুব তেজস্বী। অন্য জায়গায় কেন ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না? এটাই ছিল তাঁর বড় প্রশ্ন। সুরাট হতে তিনি ব্যবসা গোটাতে চান। মক্কাগামী জাহাজ লুঠ করবার সিদ্ধান্ত হল ইংরেজদের। এ কয়েক বছরে ভারতের মানুষেরাও ইংরেজদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছিল।

তাই আওরঙ্গজেবের পক্ষে সেই শিকড় সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব ছিল না। আওরঙ্গজেব আপোস করাই স্থির করেন।

এদিকে শায়েস্তা খাঁ আর নেই। সেখানে এসেছেন ইব্রাহিম খাঁ। ১৬৯০-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি এক আদেশপত্র পান সম্রাটের কাছ থেকে। রাজস্ব কমে যাবে এটাও মোগল সম্রাটের একটা ভাবনা। জলপথে ইংরেজদের মোকাবিলা করাও সম্ভব নয়। বহু ভারতীয় ইতিমধ্যে ইংরেজদের সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়েছে। তাই দেশীয় যুদ্ধের আদব কায়দাও ইংরেজদের আর অজানা নয়। এমত অবস্থায় আপোসই ভাল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের খেসারত বাবদ ইংরেজদের দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে—এই শর্তে আওরঙ্গজেব রাজী হন। চাইল্ডের উপর আওরঙ্গজেবের রাগ ছিল। সেই চাইল্ড মারা যাওয়ায় আওরঙ্গজেবের রাগ আর থাকলো না।

ইব্রাহিম খাঁর সাথে চার্ণকের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। আওরঙ্গজেবের ফরম্যান পেয়ে তিনি চার্ণককে ডেকে পাঠান। বাংলার কুঠীর জন্য আগেকার মত তিন সহস্র মুদ্রা শুল্করূপে দিতে হবে—অন্যান্য শর্ত পূর্বের মতই থাকবে—এই শর্তে ১৬৯০-এর ২৪শে আগষ্ট চার্ণক সুতানটীতে আসেন। ইংরেজদের মুক্তি দেওয়া হল। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অস্থিরতা থেকে অনেকটা স্থিরতার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হল। কোম্পানীর লোকেদের মনে এবার ভয় থাকল না। পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখাতে তাই পাওয়া যায়— "চার্ণক মাদ্রাজ থেকে রওনা হলেন সুতানুটীর দিকে। তাঁর এই আসার পথে কোনখানেই তিনি বাধা পেলেন না।" ১৯৪০-এ প্রকাশিত রেলওয়ে বোর্ডের পুস্তকে অন্যরকম লেখা আছে। এই পুস্তকের মতে "হুগলী ফিরিয়া গেলেও মুঘল কর্মচারীদিগের সহিত ইংরেজ বণিকদের বিশেষ বনিবনা ছিল না। সুতরাং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে জব চার্ণক সঙ্গিগণ সহ চারিখানি বাণিজ্য জাহাজযোগে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানটীতে আগমন করেন।" তাহলে কি এটা বুঝতে হবে, হিথ সাহেব মাদ্রাজে গেলেন আর চার্ণক এলেন হুগলীতে?

চার্ণকের দ্বিতীয়বার কলকাতা আসা সম্পর্কে সাহিত্যিক ও

ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও জোব চার্ণকের ১৬৯০-এর ২৪শে আগষ্ট সূতানুটীতে আগমন সম্পর্কে আমরা সবাই একমত। এটাই যথেষ্ট। এদিন হতেই প্রকৃতপক্ষে কলকাতা নগরীর পত্তন আরম্ভ হয়। সূতানুটীতে বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের পর জোব চার্ণক স্বয়ং সেই কুঠী ও তার এলাকাভুক্ত উপনিবেশের অধ্যক্ষ হন। কোম্পানীর এলাকায় যারা বাস করবেন তাদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেবারও সিদ্ধান্ত নেন চার্ণক।

চার্ণক সূতানুটীকে কেন পছন্দ করেছিলেন তা খতিয়ে না দেখলে কলকাতার পত্তনের ইতিহাস জানা যাবে না। সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমে গেল। এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম নদী বন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হল হুগলী থাকাকালীন হুগলীতে চার্ণকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে। সে সময়ে আদি গঙ্গার উত্তরে মালবোঝাই জাহাজ যেতে পারত না। খিদিরপুর হতে ছোট জাহাজ বা নৌকায় করে মালপত্র হুগলীতে আনা হতো। সূতানুটীতে কুঠী স্থাপিত হলে এই অসুবিধা আর থাকে না। এছাড়া সূতানুটী গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধাও ছিল। এর পূর্বদিকে ধাপার প্রকাণ্ড ঝিল। ফলে মারাঠা দস্যু ও মোগলদের উৎপাতের ভয়ও ছিল কম। তৃতীয়তঃ, সূতানুটী হতে সমুদ্রে সহজেই জাহাজ চলাচলের সুবিধা ছিল। এসকল কারণেই সুতানুটীর উপর জোব চার্ণকের আকর্ষণ ছিল বেশী।

চার্ণক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এ নিয়ে বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মতামত সম্পর্কে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ডঃ কিরণ চৌধুরীর মতে, "জব চার্ণক যিনি চট্টগ্রাম আক্রমণের সূত্রে ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ শুরু হইলে বাংলা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তিনি ঐ বৎসর (১৬৯০) আগষ্ট মাসে বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া সূতানুটীতে একটি বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করেন। উহাই ছিল কলিকাতা মহানগরীর গোড়া-পত্তন।" শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' বাংলা সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখা আছে—"১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর দিবসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ জব চার্ণক বাংলার সুবাদারের সহিত বিবাদ

করিয়া হুগলীর কুঠী পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণপত্নী সমভিব্যহারে হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণেস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী সূতানুটী নামক গ্রামে আসিয়া এক নিমবৃক্ষতলে আপনার শিবির ও নূতন কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে চার্ণক কিছুদিনের জন্য সেখান হইতে তাড়িত হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুণরায় ১৬৯০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া সূতানুটীতে কুঠী নির্মাণ করেন। ইহাই কালে কলিকাতা রূপে পরিগণিত হইয়াছে।" বাংলার অনেক গুণমুগ্ধ ব্যক্তি মহানগরী কলকাতার প্রতিষ্ঠাতারূপে চার্ণককেই সম্মানে ভূষিত করেছেন। কেউ বলেছেন কলকাতার সৃষ্টি নিজস্ব গতিতেই হয়েছে। কারো মতে পর্তুগীজরা বা আর্মেনীয়ানরা কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেউ কেউ অন্য কোন ইংরেজকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন। প্রত্যেকেরই যুক্তি আছে। সুতরাং আমাদের আলোচনার মাধ্যমে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

কলকাতা সম্পর্কে প্রাচীন কলকাতা সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকদের লেখা রচনাবলীতে সম্পাদক নিশীথরঞ্জন রায় ভূমিকায় লিখেছেন, "জোব চার্ণকের তৃতীয়বার সূতানুটি ঘাটে নোঙর ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে শহর কলকাতাব গোড়াপত্তনের ইতিহাস—এই ধরণের মতবাদই আজ প্রায় সর্বজন স্বীকৃতিধন্য হয়ে উঠেছে। এর মূলে রয়েছে ইংরেজী সূত্রের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা।" নিশীথরঞ্জন রায়ের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আসলে আমরা নিজেদের বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তবে যারা ইংরেজ লেখকদের সূত্র হতেই চার্ণককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন তাদের লেখা হতেই আমাদের তথ্য বের করে চার্ণক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নয় এই সিদ্ধান্তে পৌছোতে হবে।

নগেন্দ্রনাথ পালের 'কলকাতা কলকাতা' কাব্যগ্রন্থে 'জব চার্ণকের মেয়ে' কবিতায় আছে—

জব চার্ণকের মেয়ে, তবু পুরো হওনি ফিরিঙ্গি
কত ছোট ছিলে তুমি, আজ হলে কত বড় ধীঙ্গী।

সত্যি কলকাতা ছোট হতে বড় হয়েছে। জোব চার্ণকের পালিত

মেয়ে কলকাতা। ১৬৯০-এর ২৪শে আগষ্ট মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েই তিনি খালাস। পিতার কর্তব্য পালন করলেন না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ'র একটি সংখ্যায় চার্ণক সম্পর্কে বলা হয়েছে—"He had no large or comprehensive views; he was vacillating, timid and cruel." কাশিমবাজার হতে হুগলীতে চার্ণক ত্বু নম্বর কর্মচারী হয়ে আসেন। তিনি নিষ্ঠুর, ভীরু ও দোতুল্যমান চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকে অনেকে মেনে নিতে পারেন না।

চার্ণক ১৬৯৩-এর ১০ই জানুয়ারী মারা যান। তাঁর পালিতা কন্যা কলকাতা আপন গতিতে বড় হতে থাকে। অযত্নে বাড়তে থাকে। চার্ণকের মৃত্যুর পর মাদ্রাজ হতে গোল্ডস্‌বরার কলকাতায় এসে অবাক হন। তাঁর কলকাতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি উপলব্ধি করেন তিন বছরে চার্ণক কলকাতার জন্য কিছুই করেন নি। পাকা বাড়ী গুদামঘর, গীর্জা কিছুই না। কুঠীর অধ্যক্ষ ফ্রান্সিসকে তিনি বরখাস্ত করেন। ঐ পদে নিযুক্ত হন চার্লস আয়াব।

ঐতিহাসিক উইলসনের মতে সূতানটীতে প্রথমে খড়ের ঘর ছিল। ক্রমে ক্রমে পাকা বাড়ী তৈরী হয়। বেঙ্গল কাউন্সিলে তখন চার্ণক, এলিস ও পিচি তিনজন কর্মকর্তা। কাউন্সিল ঘর-বাড়ী তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেন। জন এলিস নিজের জন্যই একটি পাকা বাড়ীর দাবী জানান। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী ব্লেশেনডেন তাঁর 'ক্যালকাটা এ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট' গ্রন্থে বলেছেন—"These mud-walled and thatched houses which could have been no better than native huts, were the nucleus of the city of Calcutta." যাই হোক চার্ণকের আমলে কলকাতার উন্নয়ণের জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশি একথাও আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন জোব চার্ণক সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। তাতেই কোম্পানীর কাগজপত্রাদি রাখা হতো।

এবার প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক কাছারী বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোন দরবেশ বা সাধু থাকতেন না। সেখানে খাজনা আদায়ের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা

ছিল। খাজনা আদায় না হোক অন্ততঃ টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল। আশেপাশে জনবসতি না থাকলে কারা ঐ কাছারী বাড়ীতে আসতো ? তাহলে চার্ণক কলকাতা আসার পূর্বে কলকাতায় যে জনবসতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অতুলকৃষ্ণ রায়ের 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' হতে জানা যায় পর্তুগীজরা কলকাতায় বহু পূর্বে এসেছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবাহিনীতে অনেক পর্তুগীজ ছিল। রডা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় রডা তখন কলকাতার আশেপাশে কতগুলো দুর্গ তৈরী করেন। ঐ সময় কলকাতা জলাশয়, খাল ও বিলে ভর্তি ছিল।

অজিতকৃষ্ণ রায়ের 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' হতে আমরা জানতে পারি দ্বাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা জনবসতি অঞ্চল ছিল। ঐ সময় কলকাতায় তথাকথিত ছোট জাতের লোকেরা, যথা পোদ, জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি সম্প্রদায় বাস করতো। মাছধরাই তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল। এছাড়া শিকারী, ব্যাধ, কাঠুরে, তান্ত্রিক, সাধু, সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীদের আনাগোনায় তখন কলকাতা জমজমাট ছিল। এই লেখকের এই পুস্তক হতে আরো জানা যায় ১৬শ শতাব্দীতে কালীঘাটের মন্দির ভবানীপুরে ছিল। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক তীর্থযাত্রীরা নিশ্চয়ই কালীঘাটের মন্দিরে আসত। সাবর্ণ চৌধুরীরা বড়িষা হতে হালিশহর পর্যন্ত জ্ঞাতীদের স্বার্থে সংযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা তৈরী করেছিলেন। সে যুগে এই দীর্ঘ পথ তৈরী করা সহজসাধ্য ছিল না। কলকাতা নিশ্চয়ই উন্নত জনপদ ছিল। ফাঁকা জায়গায় কি রাস্তাঘাট কেউ তৈরী করতে যায় ? জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা নিশ্চয়ই অত বোকা ছিলেন না ?

নরেন্দ্রনাথ শেঠের 'কলিকাতার তন্তু বণিকদের ইতিহাস' হতে জানা যায় ১৬৮৭তে ইংরেজরা কালীক্ষেত্রে বিনা অধিকারে থাকত এবং তাঁরা সাবর্ণ চৌধুরীদের অনুগৃহীত প্রজা ছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয়দের মত ইংরেজদের কোনরূপ মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।

জোব চার্ণক সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রীর যুক্তি আরও জোরালো। তিনি

প্রশ্ন তুলেছেন—হুগলী হতে ৪০০ শত লোক নিয়ে চার্ণক প্রথমবার সুতানুটীতে ২ মাস থাকেন। "একাধিক দেশি লোকের সাহায্য ছাড়া কি কোন জনবসতিহীন জঙ্গলে একটানা দুমাস বাস করে যাওয়া সম্ভব ? কিন্তু ইতিহাসের কোনখানেই এই প্রসঙ্গ সুতানুটীর দেশি মানুষদের উল্লেখ নাই।"

আসল কথাটা বোঝা দরকার। ইংরেজরা সচেতনভাবেই কলকাতার জনবসতি সম্পর্কে কোন তথ্য কোথাও লেখেননি। জেমস্ লং সাহেবের লেখা, 'ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইট্স্ নেবারহুড' থেকেও কলকাতার জন-সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কটনের 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' হতে জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে শেঠবসাকরা গোবিন্দপুরে বাস করতেন। মিস্ ব্লেশেনডেন বলেছেন—Chuttanatty, where Charnock launched, was a thriving village occupied by weavers. এই থ্রাইভিং কথার মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে আছে। পূর্ণেন্দু পত্রী দৃঢ়ভাবে তাই প্রশ্ন করেছেন—"কত ঘর তাঁতি বাস করলে গড়ে তুলতে পারে একটা থ্রাইভিং ভিলেজ ? সুতানুটিতে যদি সত্যিই এত তাঁতি, তাহলে সেটা পুরোপুরি জঙ্গল হয় কি করে ? ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নিজেদের স্বার্থেই এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। বাঙালী ঐতিহাসিকরা ইহা অনুকরণ করেছেন। সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা বিষয় তিনশত বছর ব্যাপী আমাদের কাছে সত্য হয়ে আসছে।"

রাধারমণ মিত্র চার্ণক সম্পর্কে প্রশস্তি গান নি। তিনি বলেছেন, "১৬৮৭ হতে ১৬৯০-এর ২৪শে আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত সুতানুটীতে কার অনুমতি নিয়ে চার্ণক এসেছিলেন ?" পূর্বে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইংরেজরা সাবর্ণ চৌধুরীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে কলকাতায় থাকতেন। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, "১৬৮৭ হতে ১৭০৯ পর্যন্ত ইংরেজরা কোথায় উপাসনা করতেন ? ধর্মপ্রাণ ইংরেজদের সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক।" চার্ণক সম্পর্কে প্রশস্তি না গাইলেও ইংরেজদের পূর্বে কলকাতায় অন্য ইউরোপীয়দের আগমন রাধারমণ মিত্র মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "আর্মেনিয়ানরা ১৬৩০ হতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯০ বছর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতো

অথচ তাদের মধ্যে একটিও মরলো না—এটি কি করে সম্ভব হতে পারে? যদি মরতো তবে নিশ্চয়ই কবর থাকতো। এবং যদি বাস করত নিশ্চয়ই মরতো। সুতরাং ইংরেজ আসার দুপুরুষ আগে কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের উপনিবেশ ছিল—এটা আষাঢ়ে গল্প।" পূর্ণেন্দু পত্রী পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, "ইংরেজরাই বা তাহলে উপাসনা করতো কোথায়?" আসলে উপাসনার স্থান ও কবর স্থান কোন প্রমাণই নয়। বর্তমানে কি সব গ্রামে মসজিদ আছে? মসজিদ না থাকলে কি নামাজ পড়া আটকে থাকে? কবরের নির্দিষ্ট স্থান না থাকলে মানুষতো যে কোন স্থানেই প্রিয়জনদের কবর দিয়ে থাকে। তাই রাধারমণ মিত্রের উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা আর্মেনীয়ানদের কলকাতায় আগমন সম্পর্কে কোনরূপ নেতিবাচক মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

মেসরোড সেথ নামক আর্মেনীয়ান ঐতিহাসিক বলেন—আরমানী গীর্জায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফলক হতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তারাই কলকাতার প্রাচীন অধিবাসী। রাধারমণ বাবু বলেছেন যে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের কাছ হতে আর্মেনীয়ানরা ফরমান পেয়েছিল। কিন্তু তিনি আর্মেনীয়ানদের উপাসনাগৃহ ও কবরখানার প্রশ্ন তুললেও ইংরেজ-দের সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলেন নি। এখানেই হল মজার ব্যাপার। বাঙ্গালী লেখকরা ইংরেজদের অনুকরণেই নিজেদের বক্তব্যকে যে কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর।

কটন সাহেবের লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে পর্তুগীজরা কলকাতায় এসেছিল ইংরেজদের পূর্বে। প্রফুল্লনাথ সান্যাল 'সাহিত্য সংবাদ' পত্রিকায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা হিসাবে আর্মেনীয়ানদের ইংরেজদের থেকে ৫০ বছরের পুরানো বলে দাবী করেছেন। H. W. R. Monero বলেছেন—Job Charnock, the founder of Calcutta and Armenian controvery. তাই আর্মেনীয়ানদের সম্পর্কে যুক্তি এই উক্তির মাধ্যমে আরও জোরালো হল। অজিতকৃষ্ণ রায়ের 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' হতে জানা যায় এসম্পর্কে আরও কিছু তথ্য। "১৬৮৮-তে চুক্তি অনুযায়ী আর্মে-নীয়ানদের সাথে ১৬৮৯-তে একটা চ্যাপেল গড়ে তোলে ইংরেজরা।

১৬৮৯-তে যদি এই চ্যাপেলটা তৈরী হয়ে থাকে তবে আর্মেনীয়ানদের কলকাতার আদি বাসিন্দা বলতে দোষ কোথায় ?

মনরো সাহেব আর্মেনীয়ানদের কলকাতার আদি বাসিন্দাই বলেন নি। তাঁর লেখা হতে আমরা জানতে পারি ১৬৮৮-তে আর্মেনীয়ান-দের নেতা খোজা ফান্‌স ক্যালেণ্ডারের প্রভাবে আর্মেনীয়ানদের সাথে ইংরেজদের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ীই ১৬৮ -তে ইংরেজ কোম্পানী আর্মেনীয়ানদের জন্য একটা কাঠের চ্যাপেল তৈরী করে দেয়।

ইংরেজরা আর্মেনীয়ানদের জন্য কি বিনা স্বার্থে চ্যাপেল তৈরী করে দিয়েছিল ? সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া ইংরেজদের কাছ থেকে এটা আশা করা বৃথা। আর্মেনীয়ানরা বাণিজ্যে পটু ছিলেন। তাদের কাছে ইংরেজদের বাণিজ্যের কৌশল শেখাও তাঁদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া মোগল দরবারে আর্মেনীয়ানদের আধিপত্য ছিল। তাদের সাহায্যে মোগল সম্রাটদের প্রভাবিত করাও ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইংলণ্ডে আর্মেনীয়ানদের সাথে ইংরেজদের একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয় যে ইংরেজদের জাহাজে আর্মেনীয়ানরা 'কেপ রুটে' বাণিজ্য করবে। তারা ভারতে বাণিজ্য করবে না। এই চুক্তি অনুযায়ী আর্মেনীয়ানরা বোম্বাই চলে যায়। আর্মেনীয়ানদের পক্ষে খোজা ফান্‌স আর খোজা সরহদ সাক্ষর করেন এ্যানি বেসিনের মতে—This treaty struck the death-knell to Armenian commercial ascendency in India. অর্থাৎ এই চুক্তির ফলে ভারতে আর্মেনীয়ানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসান ঘটে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আমেনীয়ানরা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়নি। তাঁরা ইংরেজদের বাণিজ্যের বাজার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। সন্ধির পরিবর্তে ইংরেজরা চ্যাপেল তৈরী করে দিল। তাঁরা বন্ধুত্বও পেল। পরবর্তীকালে আর্মেনীয়া খোজা সরহদর ইংরেজদের তিনখানা গ্রাম কিনতে সাহায্য করেন। তাহলে আর্মেনীয়ানরা কল-কাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে ক্ষতি কি ?

পর্তুগীজদের সম্পর্কে পূর্বে অনেক কথাই বলা হয়েছে। শাহজাহানের আমলে পর্তুগীজরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠী স্থাপন করে। জাহাঙ্গীরের আমলেও তাদের প্রভাব ছিল। পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচার বাংলার উপকূলে একসময় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। শোনা যায় বেগম মমতাজের তুজন দাসীকে পর্তুগীজরা আটক করে নিপীড়ন চালিয়েছিল। বাংলার সুবাদার কাসেম খাঁকে শাহজাহান পর্তুগীজদের দমনের আদেশ দেন। শাহজাহানের আদেশ মত নৌবহর ও স্থলবাহিনী গঠন করে ১৬৪১-এ অভিযান চালিয়ে গঙ্গার তুই তীর হতে তিনি পর্তুগীজদের ঘাঁটি উৎখাত করেন। বহু পর্তুগীজ এ যুদ্ধে নিহত হয়। এ ঘটনা হতে অনুমান করা যায় পর্তুগীজরা কলকাতায় ইংরেজদের পূর্বেই এসেছিল। রাজনারায়ণের 'কলকাতা' হতে জানা যায় ১৬৫০-এর ২২শে আগষ্ট পর্তুগীজরা কলকাতায় প্রথম বাণিজ্য করতে এসেছিল। পর্তুগীজরা যে কলকাতার আসি বাসিন্দা এ কথা উপরোক্ত তথ্য হতে সহজেই অনুমান করা যায়।

মোগলদের আকবরের আমল হতেই পর্তুগীজদের সাথে সম্পর্ক ছিল। তারা অন্যান্য ব্যবসায়ের সাথে ক্রীতদাসের ব্যবসা করতো। আর্মেনীয়ানদের সাহায্যে তারা সূতা ও নটীর কাজ করাতো। সূতানটী কথার এভাবেই উৎপত্তি। অনেকের মতে রতন সরকারকে বাদ দিয়ে কলকাতার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। রতন সরকার জাতিতে ধোপা ছিলেন। সে পর্তুগীজদের দালালী করত। হরিহর শেঠের প্রাচীন 'কলকাতা পরিচয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'থ্যাকন' নামক একটি জাহাজ কলকাতায় পৌছালে উহার কাপ্তেন রতন সরকারকে দোভাষীরূপে নিযুক্ত করেন। বহু তথ্য হতে জানা যায় রতন সরকার পর্তুগীজ ভাষা জানতো। সে সময় ষ্টাফোর্ডের পর্তুগীজ দোভাষী খোঁজাই উদ্দেশ্য ছিল। কি করে রতন সরকার পর্তুগীজ ভাষা জানলেন? কলকাতায় পর্তুগীজদের আনাগোনা না থাকলে কিংবা তাদের কেউ কেউ কলকাতায় বাস না করলে পর্তুগীজ ভাষা রতন সরকারের পক্ষে কি করে জানা সম্ভব? পর্তুগীজরা কলকাতায় যে ইংরেজদের থেকে পূর্বে এসেছিল এ তথ্য তা প্রমাণ করে।

শুধু ঐতিহাসিকই নন, সমাজ সচেতকরূপে ডাঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইতিহাসকে তিনি এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তিনি "প্রাক্ পলাশী বাংলা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"তিনটি বিদেশী উপনিবেশের আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা। এ ভাষা হল খানিকটা বিকৃত পর্তুগীজ। পর্তুগীজ কলকাতার কথ্য ভাষা। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যারা কলকাতায় আসত তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলক কিছুটা পর্তুগীজ ভাষা শিখতে হতো। তিনটি উপনিবেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কথাবার্তায় পর্তুগীজ ব্যবহৃত হতো। এ যুগের কলকাতার ইংরাজ ও পরিচালকদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা পর্তুগীজ।" প্রাক্ পলাশী বাংলা বলতে ১৭০০ হতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ডাঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ধরেছেন। বহু প্রাচীন ইতিহাস পুস্তক হতে উদ্ধৃতি সহকারে তার এই পুস্তক লিখিত। এই ভাষা প্রশ্নটা হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়—কলকাতার জোব চার্ণকের পূর্বে পর্তুগীজরা এসেছিল। তাহলে পর্তুগীজরা কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা—একথা আমরা জোড় করে বলতে পারি।

আর্মেনীয়ানরা বা পর্তুগীজরা কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হতে পারে? ইংরেজদের মধ্যে যেমন জোব চার্ণকের নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আর্মেনীয়ানদের ও পর্তুগীজদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে কোন নেতা বা ব্যক্তির নাম কেউ দাবী করেন নি। অপর দিকে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ইংরেজদের কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর যুক্তিকেও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না।

ইনি হলেন সমবেন রায়। পশ্চিমবাংলার অন্যতম বিখ্যাত পত্রিকা 'বর্তমানে'র ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের ৩২২ সংখ্যায় "ইংরেজ বণিকের আগমনেই কি কলকাতার প্রতিষ্ঠা" নামক প্রবন্ধে চার্ণকদের জীবন-কাহিনী, পর্তুগীজদের কথা, কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছেন, "মাদ্রাজ হতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেব গোলড্‌জ্‌বরা সূতানটীতে এলেন। ব্যাপার দেখে তাঁর চক্ষু স্থির। জোব চার্ণক তখন মৃত। ফ্রান্সিস এলিস তখন চার্ণকের স্থলে

অভিষিক্ত। এলিস্ বরখাস্ত হন। গোলস্‌বরা সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী ভাড়া নেন। তিন মাস পরে গোলস্‌বরা মারা যান। চার্লস আয়ার এলেন কুঠী নির্মাণের দায়িত্বে। এই সময় হতেই কলকাতার পত্তন শুরু।" এটা ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাহলে কলকাতার বয়স তিনশত বছর হতে এখনও কয়েক বছর বাকী। চার্লস আয়ারই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। তাহলে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতারূপে আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের নামই বার বার এসে যায়।

এবার অন্য কথায় আসা যাক। ১৬৮৬তে হুগলী হতে সব গুটিয়ে চার্ণক যখন কলকাতায় আসেন তখন সেখানকার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় চারশত ইংরেজ এবং ৫ ঘর বাঙ্গালী। সত্যি কি সংখ্যাটা এরূপ, না তার বেশী?

বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পুস্তকের মাধ্যমে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের একটা হিসাব পাওয়া সহজেই সম্ভব ঃ

(১) কটন সাহেবের 'ক্যালকাটা ওল্ড এ্যাণ্ড নিউ' নামক পুস্তক হতে জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে শেঠ বসাকরা গোবিন্দপুরে এসেছিলেন। ব্যবসায়ে সুবিধার জন্য সপ্তগ্রাম হতে তাঁরা আসেন। তাঁরা তুলো ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

(২) 'তন্তুবায় সমিতির ইতিহাস' নগেন্দ্রনাথ শেঠের লেখা। এ থেকে জানা যায় বরাহনগরে তন্তুবায় বসাকরা থাকতেন। তাঁরা বিদেশী বণিকদের কাছে কাপড় বিক্রয় করতেন। তাঁরা ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপুরে উঠে আসেন।

(৩) অজিতকৃষ্ণ রায়ের 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে আরও তথ্য জানা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব হতেই কলকাতা জনবসতি অঞ্চল ছিল। কালীঘাটের পুরোহিত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, চীৎপুরের দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ, হাটখোলার দত্ত পরিবার কলকাতার আদি বাসিন্দা। ১৫২০-৩০-এ গৌরদাস বসাক কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পর্তুগীজরা শেঠবসাকদের কাছ হতে কাপড় কিনতো। সম্রাট আকবরের সময় গোবিন্দশরণ দত্ত টোডরমলের অধীনে কাজ করতেন। হাওড়ার আন্দুল হতে তিনি সপরিবারে গোবিন্দপুরে আসেন। কালী-

ঘাটের হালদার বংশের আদি পুরুষ ভবানী চক্রবর্তী কলকাতার আদি বাসিন্দা ছিলেন। পনেরো শতকে চীৎপুরে দে বংশের একজন বাস করতেন। এই বংশের চক্রপাণি গৌড়ের নবাবের সেনাপতি ছিলেন। এছাড়া গোবিন্দশরণ দত্তের পৌত্র রামচন্দ্র দত্ত ইংরেজরা কলকাতায় আসার পূর্বেই হাটখোলায় বাড়ী তৈরী করেন।

(৪) নগেন্দ্রনাথ শেঠের 'তন্তুবায় সমিতির ইতিহাস' হতে আরও তথ্য জানা যায়। ১৫৩৭-এ মুকুন্দরাম শেঠ কালিদাস বসাককে নিয়ে কালীঘাটে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এদের পূর্বপুরুষ সাগররাম ১৬৩২-এ তাঁতিদের গোবিন্দপুরে নিয়ে আসেন। এই পুস্তক হতে জানা যায় ১৬৬০-এ সূতানুটীতে অনেক তাঁতীর বাস ছিল। ঐ সময় চাঁদপাল নামে এক তাঁতী ছিলেন। তাঁর নামানুসারেই বর্তমান চাঁদপাল ঘাটের নাম হয়েছে। ১৬৬০ হতেই সুতানুটী নামের সৃষ্টি হয়েছে। কাশিম-বাজারের তন্তুবণিক কেশবরাম বসাকের পুত্র কালিদাস ১৫৩৭-তে মুকুন্দরাম শেঠের সাথে গোবিন্দপুরে চলে আসেন। ১৫৯১-তে বাসুদেব বসাক পাঠান আক্রমণে ভীত হয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে গোবিন্দপুরে চলে আসেন। বারপতি বসাক ১৬৯২-তে সপ্তগ্রাম হতে গোবিন্দপুরে আসেন। যদিও তাঁর কলকাতায় আগমন চার্ণকের পরে তথাপি একথা বলতেই হবে বহুপূর্বে আগত তাঁতিগোষ্ঠীদের টানেই তিনি গোবিন্দপুরে আসেন। ১৬৮৬-৮৭-তে কলকাতার প্রথম কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র গোবিন্দপুরে থাকতেন। জয়রাম মল্লিক কলকাতা আসেন সুবর্ণরেখা নদীর তীর হতে। এই পুস্তক হতে অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। কোন্নগরের মিত্ররা কলকাতায় ইংরেজরা আসার পূর্বেই এসেছেন। মনোহর ঘোষ কলকাতার একজন প্রাচীন বাসিন্দা। তিনি টোডরমল্লের অধীনে গোমস্তার কাজ করতেন। এই বংশের হরিঘোষের পরিবারে বহু আত্মীয়স্বজন থাকতেন। ঐ থেকেই "হরিঘোষের গোয়াল" কথাটার উৎপত্তি।

(৫) লোকনাথ ঘোষের "কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত" হতে আরও তথ্য জানা যায়। বর্গী হাঙ্গামার পূর্ব হতেই পাথুরিয়াঘাটা ও চোরা বাজারের মল্লিক পরিবারের ১৫শ পুরুষ জয়রাম মল্লিক প্রথম কলকাতা

আসেন। ঐ সময়ে কলকাতায় ইংরেজ শাসন শুরু হয়নি। বড়-বাজারের মল্লিক পরিবারের কৃষ্ণদাস মল্লিক ১৬০১-এ জন্মগ্রহণ করেন সপ্তগ্রামে। ১৬৮০তে তিনি মারা যান। তিনি কলকাতায় ইংরেজরা আসার পূর্ব হতেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। ১৭০৩-এ রাজারাম মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দর্পনারায়ণ খুড়তুত ভাই সুখদেবকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। মুসলমানদের অত্যাচারই তাদের সপ্তগ্রাম ছাড়তে হয়েছিল। সমৃদ্ধ জনপদ না হলে তাঁরা কি কলকাতায় আসতেন ?

এই পুস্তক হতে আরও জানা যায় বাগবাজারের মুক্তারাম বসুর ২১শ পুরুষ দেওয়ান নিধুরাম গৌড় ছেড়ে বাগবাজারে আসেন ইংরেজদের পূর্বে। দরমাহাটার রসিকলাল ঘোষের সম্পর্কে এই পুস্তকে রয়েছে— “কালীচরণ ঘোষ থেকে এই বংশের সূত্রপাত। কালীচরণের পুত্র রামদুলাল চন্দননগর ছেড়ে কলকাতায় বসবাসের জন্য চলে আসেন। সে সময় ইংরেজরা এখানে কেনা-বেচার ব্যবসায় শুরু করেছেন। পর্তুগীজ বণিকদের কলকাতার এজেন্ট হয়ে তিনি ধনী হয়ে ওঠেন।” এই তথ্য হতে পর্তুগীজরা ইংরেজদের পূর্বে কলকাতায় এসেছিল তা প্রমাণিত হয়।

এভাবে কলকাতায় জোব চার্ণক আসার পূর্বেই বহু লোকের বাস ছিল। তাই জোর গলায় আমরা বলতে পারি চার্ণক যখন ৪ শত লোক নিয়ে কলকাতায় প্রথম আসেন তখন কলকাতায় পাঁচঘর বাঙ্গালী ছিল— এই যুক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। আরও সোজা কথায় বলা যায়, চার্ণক কলকাতায় যখন তৃতীয়বার আসেন তখন কলকাতা একটি উন্নত জনপদ।

কলকাতা চার্ণকের তৃতীয়বার আগমনের সময় যে উন্নত জনপদ ছিল তা 'অজিতকৃষ্ণ রায়ের 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' হতেও জানা যায়। ঐ সময় ইংরেজরা অনেকেই নৌকায় বাস করতো জায়গার অভাবে। বৃদ্ধ চার্ণকের কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পর্তুগীজ ও আর্মেনিয়ানরা ইংরেজদের কুঠীর আশেপাশেই থাকতো। দেশীয় আচার-ব্যবহারে ইংরেজরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে তাদের বিবাহও হয়। এসব তথ্যই প্রমাণ করে কলকাতার উন্নত জনপদের কথা।

পূর্ণেন্দু পত্রী সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন—'তিন বছরের বসবাসের সুবাদেই কি তিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা ?' গোল্ডস্‌বরা চার্ণকের মৃত্যুর পর তিন মাসে কেল্লা তৈরী করেছেন। লালদীঘির সংস্কার করেছেন। তাহলে গোল্ডস্‌বরাকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতেই বা ক্ষতি কি ? এ ধরণের প্রশ্নও তো করা সম্ভব ? সমবেন রায়ের তথ্যও পূর্বে বলা হয়েছে। তাহলে কলকাতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা ? এর সমাধান তো করতে হবে ?

কলকাতার আশে-পাশের উন্নত জনপদগুলির প্রাচীনত্ব হতেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। হাওড়ার দক্ষিণে বেতোড় নামক গ্রাম অতি প্রাচীন। মনসামঙ্গলে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের মতে চাঁদ সওদাগরের নৌকা এখানে থেমেছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিডার ফেড্রারিক নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক এখানে আসেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে পর্তুগীজরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসতো। যাবার সময় তারা অস্থায়ীভাবে তৈরী ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিত। বরাহনগরের গুরুত্ব চৈতন্যদেবের আমল হতেই। এখানকার মালিপাড়ার ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ী বলে পরিচিত বৈষ্ণব শ্রীপাটে একসময়ে চৈতন্যদেব পদার্পণ করেন। কলকাতা হতে বেশ কিছু দূরে হাড়োয়ায় বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদ বা গোরাই গাজীর সমাধি। বেহালা অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম। জোব চার্ণক কলকাতা আসার পূর্ব হতেই বেহালা গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বড়িষা অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরী, বংশের সন্তোষ রায় কালিঘাটের মন্দির নির্মাণ করেন। কলকাতার পূর্ব হতেই এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বড়িষার কাছে রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়ের রাজধানী ও দুর্গ ছিল। ওলন্দাজরা ফলতায় ইংরেজদের আগমনের পূর্বেই কুঠী নির্মাণ করেছিল। ফলতার ভুরি শ্রেষ্ঠ রাজার কাহিনী বিখ্যাত। আমতা হাওড়া হতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্দির তৈরী হয়। কালিঘাট কলকাতার সৃষ্টির পূর্ব হতেই উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র বলে পরিচিত ছিল।

চারপাশে উন্নত জনপদ থাকলে মাঝখানে অনুন্নত জনপদ কি করে থাকা সম্ভব ? অন্ততঃ একটু উন্নত হতেই হবে। কলকাতার আশে-

পাশের সে সময়কার উন্নত জনপদ প্রমাণ করে সে সময় কলকাতা একেবারে অনুন্নত ছিল না। তাই জোব চার্ণকের কলকাতা আগমনের সময় কলকাতা জঙ্গলাকীর্ণ থাকলেও জনশূন্য ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে কলকাতাও উন্নত ছিল। এই তথ্য জোব চার্ণককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার গৌরব হতে অনেকটা দূরে সরিয়ে নেয়।

জোব চার্ণক কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবার পূর্বের কলকাতাকে দেখার পর আমাদের চার্ণকের পরের কলকাতাকে দেখতে হবে।

কবি নগেন্দ্রনাথ পাল রুগ্ন কলকাতাকে দেখে আক্ষেপ করেছেন—

সেই থেকে কাটাকাটি চলছে সমানে,
কলকাতা বাঁচবে কিনা কলকাতা জানে।

জলাভূমি কলকাতা আজ আধুনিক শহর। কোন কোন স্থানে মাটির চিহ্নমাত্র নেই। ভূমির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে বছরের পর বছর। রাস্তা হয়েছে, বাড়ী হয়েছে। আবার ওগুলো ভাঙ্গা হয়েছে। ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়েই আমরা কলকাতাকে দেখছি। কলকাতাকে ভবিষ্যতে আমরা আরও ভাল চোখে দেখতে চাই। তাই একই কবির ভাষাতেই আমাদের আশাকে ব্যক্ত করাই ঠিক।

কলকাতা, মনোরমা, চেতনা-জননী অয়ি, ওগো প্রিয়তমা,
কল্লোলিনী, ছন্দোময়ী, কবে তুমি তিলে তিলে হবে তিলোত্তমা।

জোব চার্ণকের পরে নতুন করে গড়ে উঠেছে কলকাতা। সারা ভারতকে গ্রাস করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের কৌশল কলকাতা বসেই ইংরেজরা করেছিল। সারা বাংলার মানুষেরা কলকাতায় এসে ইংরেজদের অনুগত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিভাবে অবস্থাটা পাল্টানো যায় এটাই ছিল প্রত্যেকের ইচ্ছা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে অনেকে কলকাতায় এসে জড় হয়েছেন। বহু মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছেন কলকাতায়। এক সময় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল একটি বাবু সম্প্রদায়। ধর্মের গোঁড়ামীর কেন্দ্র ছিল কলকাতা। অপরদিকে নারীমুক্তির কেন্দ্ররূপে সেযুগে কলকাতা বিখ্যাত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার

কলকাতায় ঘটেছিল। একশ্রেণীর মানুষের ইংরেজদের সেবাদাসে পরিণত হবার জন্য প্রতিযোগিতা শেষপর্যন্ত দালালীতে পরিণত হয়।

পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। স্বাধীন ভারতেও কলকাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কলকাতায় দেশ-বিদেশের রাজনীতিবিদরা এসে কলকাতার ভাবনা চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ কলকাতাকে বিস্ময়ের চোখে দেখেন। সভাসমিতি, মিছিল, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, হটকারী আন্দোলন, রাজনৈতিক তৎপরতা, শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন, নোংরা রাজনীতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন সব কিছুতেই কলকাতার ভূমিকা ঊর্ধে। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়—"কলকাতা আছে কলকাতাতেই।"

গত বছর ২৪শে আগষ্ট (১৯৮৯) কলকাতা শহরের তিনশত বছর পুর্তি উৎসবের উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ঘোড়া দিয়ে ট্রাম গাড়ী চালানো নিয়ে ঘটে গেল অনেক ইতিহাস। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা কে—এই প্রশ্নটাই অনেকের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে তিনশত বছরের কলকাতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ও তথ্যই যে কলকাতার প্রকৃত ইতিহাস একথা অনেকেই ভুলে যেতে চান।

কলকাতার ইতিহাসের গুরুত্ব অনুসারে তিনশত বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করলে সুবিধা হয়। প্রথম ভাগ হলো ইংরেজ কোম্পানির অস্তিত্ব রক্ষার ইতিহাস (১৬৯০-১৭৫৭), দ্বিতীয় ভাগ হলো ইংরেজ কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস (১৭৫৮-১৮৫৭), তৃতীয়টি হলো জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৫৮-১৯৪৬) এবং চতুর্থটি হল স্বাধীনোত্তর ভারতের কলকাতার ইতিহাস (১৯৪৭-৮৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৬৯০-১৭৫৭)

জোব চার্ণকের কলকাতায় আগমনের সময় হতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত কলকাতা তথা বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ইংরেজ শক্তির অস্তিত্ব রক্ষার ইতিহাস। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ হতে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন চার্ণক। ইব্রাহিম খাঁ তখন বাংলার সুবাদার। পূর্ব হতেই চার্ণকের সাথে ইব্রাহিম খাঁর পরিচয় ছিল। তাই ইব্রাহিম খাঁর আমন্ত্রন পেয়ে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট চার্ণক কলকাতা আসেন। কলকাতায় তৃতীয়বার এসে এলোমেলোভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন ব্যবস্থা চার্ণকের মনঃপুত হল না। তাই ১৬৯১-তে বাংলার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে আনা হল। এতে সমস্যার কিছুটা সমাধান হলেও আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। দিল্লী হতে নতুন এক হুকুমনামা জারী হল। তিন হাজার টাকা না দিয়ে অন্য কোন শুল্ক দিলে কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে, দিল্লীর এরূপ হুকুমনামা জারীতে কলকাতা কুঠীর অধ্যক্ষ চার্ণক চিন্তিত হলেন। কিন্তু চার্ণকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ব্যবস্থা একটা হবেই।

চার্ণক ১৬৯২ বা ১৬৯৩-এর ১০ই জানুয়ারী মারা যান। ১৬৯২তে তিনি মারা গেলে ঐ বছরের ২৫শে অক্টোবর হতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হেজেস ঢাকায় থাকতেন না। মৃত চার্ণক নিয়ে আলোচনা করে লাভ নাই। তবু দু-একটা কথা বলতেই হয়। সতীদাহ হতে উদ্ধার করে তিনি এক হিন্দু রমনীকে বিয়ে করেন। চার্ণক বেঁচে থাকতেই তিনি মারা যান। বর্তমান সেন্ট জন্স গীর্জার প্রাঙ্গণে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। চার্ণকের তিনটি কন্যা জন্মেছিল। প্রথমা কন্যা মেরীর স্বামী ছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আয়ার। উইলিয়াম

বাউরীর স্ত্রী ছিলেন দ্বিতীয়া কন্যা এলিজাবেথ। আর তৃতীয়া কন্যা জোনহাট ওয়াইটের স্ত্রী ছিলেন। এই দুই জামাতাও কোম্পানীর উচ্চপদে কাজ করতেন।

চার্ণক মারা যাবার পর কুঠীর অধ্যক্ষ হন এলিস। মাদ্রাজ হতে গোলস্‌বরা কলকাতায় এসে অবাক হন কলকাতাকে দেখে। চার্ণক তিন বছরে কলকাতার কিছুই উন্নতিসাধন করেন নি দেখে তিনি রেগে যান। তিনি এলিসকে বরখাস্ত করেন। মরা মানুষটার উপর রাগ করে কি লাভ? শেষ পর্যন্ত গোলস্‌বরা কতগুলো কর্মসূচী নেন। চার্ণকের পদে তিনি আয়ারকে নিয়োগ করেন। অনেকের মতে আয়ারের সময় হতেই কলকাতা শহরের ভিত্তিস্থাপন আরম্ভ। ঘটনা যাই হোক না কেন কলকাতা শহরের ভিত্তিস্থাপনকে কেন্দ্র করে চার্ণক বর্তমানে নতুন ইতিহাসের পাতায় এক বিতর্কীত নায়ক।

কলকাতা ও তার আশেপাশে দেশীয় বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল। ইংরেজরা কোম্পানীর এলাকায় নবাবী বিচার ব্যবস্থা মানতে রাজী নয়। আবার নবাবের এলাকায় বসবাসকারী ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা নিয়েও গোলমাল দেখা যায়। ১৬৯৪তে সর্বপ্রথম কোম্পানীর এলাকায় প্রথম আদালত স্থাপিত হলো। এই আদালতকে জমিদারী আদালত বলা হতো। এই বছর হতেই ভারতের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বাদশাহ ও নবাবরা শুল্ক ও উপঢৌকন পেলেই সন্তুষ্ট হতেন। দেশের কোথায় কি হচ্ছে খবর রাখতেন না। তবুও পর্তুগীজদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ভাল ছিল না। ইংরেজরা চালাক ও বুদ্ধিমান বলেই হিন্দুদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। মুসলমান শাসন হিন্দুদের মনঃপুত ছিল না। ইংরেজরা হিন্দুদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ভারতের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে আস্কারা পেয়ে ইংরেজরা বেপোরোয়া হয়ে ওঠে। লুঠতরাজ চালাতো। আবার খাজনাও বন্ধ করতো। তাই আরঙ্গজেব তৎপর হন। ইংরেজদের দমন করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ১৬৯৫-এর চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে তারা অঙ্গীকার করে যে তারা আর দস্যুবৃত্তি করবে না, খাজনা নিয়মিত দেবে এবং

সম্রাটের আদেশ মেনে চলবে। ১৬৯২ বা ১৬৯৩তে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম তৈরী হয়েছিল। ইংরেজদের কুঠী রক্ষার জন্য দুর্গটাকে স্থায়ী করা প্রয়োজন। নবাবের কাছে এ দাবী করা হলো। কিন্তু নবাব ইংরেজদের স্থায়ী কিছু করতে দিতে নারাজ।

কিন্তু শোভাসিংহের বিদ্রোহ ইংরেজদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করলো। টালা ও হুগলীর ফৌজদার দুজন এবং হুগলীর দু'তীরের জমিদারগণ শোভাসিংহের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সাহায্য চান। তাই নবাব প্রথমে কলকাতায় স্থায়ী কিছু করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও এবার বাধ্য হয়েই স্থায়ী কিছু করার অনুমতি দেন। ১৬৯৬তে দুর্গ তৈরী হতে থাকে।

কিন্তু কার জায়গায় দুর্গ তৈরী হবে? দিল্লীর সম্রাট আজিম উসমানের পুত্র ফারুকশিয়রকে ১৬ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়ে আর্মেনীয় খোজা সরহদ তিন গ্রামের তিনটি প্রজাসত্ব কিনে দেন ইংরেজদের। আর এই অধিকারের বলেই মাত্র ১৩ শত টাকায় রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় ইত্যাদি জায়গীরদারদের কাছ হতে তিনটি গ্রাম ১৬৯৬তে কেনার ব্যবস্থা হলো।

কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম ১৬৯৮তে কোম্পানী কিনে ফেলে। তিনটি গ্রামের জমিদারী কেনার পর প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানী ১৬৯৯-এ কলকাতাকে প্রেসিডেন্সীর পর্যায়ে উন্নীত করে। পরের বছর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে একজন গভর্ণরের উপর প্রেসিডেন্সীর কার্যভার দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এ বছরের ২৬শে মে স্যার চার্লস আয়ার কলকাতার গভর্ণর ও পদাধিকার বলে ফোর্ট উইলিয়ামের সভাপতি হন। আয়ার ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। তারপরে এই পদে নিযুক্ত হন জন বিয়ার্ড। কলকাতায় একটা কাউন্সিল গঠিত হল। এ বছরই এই কাউন্সিলকে একজন সভাপতির অধীনে আনা হল।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরী ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হলেও ১৭০২তে তার দ্বিতীয় রক্ষণ প্রাচীর তৈরী হল। প্রথম রক্ষণ প্রাচীর ১৬৯৭তে শেষ হয়েছিল। কটা প্রাচীর তৈরী হয়েছিল তা জানা না গেলেও দুর্গের

দেওয়ালে গাঢ় লাল রঙ লাগিয়ে ১০ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট বর্গাকার খোপ কাটা হল। দুর্গটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় হয়। দূর হতে কৌতূহলের সাথে কলকাতার মানুষেরা তখন দুর্গটি দেখতো।

বড়বাজারের নাম তখন বড়বাজার ছিল না। তার নাম ছিল কমলবায়নের বেড়। চার্ণকের কলকাতায় আগমনের পূর্বে বড়বাজারের অস্তিত্ব ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা ঐ বাজার হতেই বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনতেন। সপ্তগ্রামের রাজারাম মল্লিক (১৬৩৬-১৭০২) ইংরেজরা কলকাতায় আসার পূর্ব হতেই কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। রাজারামের দুই পুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ। দর্পনারায়ণ (১৬৭২-১৭৪০) মুসলমান সরকারের অত্যাচারে ভীত হয়ে খুড়তুত ভাই সুখদেবকে নিয়ে কলকাতায় ১৭০৩-এ স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এরা দুজনই বড় বাজারের মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টাদশ শতাব্দী হতে বড়বাজারের মল্লিকদের সাথে কলকাতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

কলকাতার উন্নতি হতে থাকে। বাংলার বর্ধিষ্ণু পরিবারেরা রুজিরোজগারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ভীড় করতে থাকেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে কোম্পানীর উন্নতি হতে থাকে। এ বছর (১৭০৩) কলকাতা বন্দর হতে ৫২১৬৪৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি কোম্পানী রপ্তানি করে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রখণ্ড ও কাঁচা রেশমই ছিল প্রধান। পরের বছর ১৭০৪-এ এই পরিমাণ কমে ৯৬১৯২ টাকায় দাঁড়ায়। ফোর্ট উইলিয়ামের ডাইরী ও কনসালটেশন বুক (১৭০৩-১৭০৪) হতে জানা যায় যে কোম্পানীর অধীনে কোতোয়াল, কেরাণী, পিওন, পাইক, কর সংগ্রাহক, ড্রামার, পাইকার, দালালখোর, শিকদার, মণ্ডল, পাটওয়ারি ও ভকিল প্রভৃতি পদে মোট ৩৫ জন কাজ করতেন। মাসে ১ টাকা হতে সাড়ে চার টাকার মধ্যে এদের বেতন ছিল। এ সমস্ত পদে ইংরেজরাই কাজ করতো। কিন্তু দুর্জয় প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে বাংলার মাঝি-মল্লারাই বরাবর অভ্যস্ত। তাই কোম্পানী মাঝিমল্লা পদে দেশীয়দের নিয়োগ করতে থাকে।

কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কলকাতায় একটা অর্থ-নৈতিক জোয়ার এলো। কিন্তু বন্দর শুল্কের পরিমাণ বাড়লো না। ঐ

সময় বন্দর শুল্কের হারও ছিল খুব কম। শুল্ক বাবদ ১৭০৪ এ কলকাতা বন্দর হতে ৫ শত টাকাও আদায় হয়নি।

পৌর ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিক হতে কলকাতা মহানগরীর উন্নতি হতে থাকে। ১৭০৪ এ কোম্পানী নির্দেশ দেয় যে ভারতীয়রা কোম্পানীর এলাকায় কোনরূপ অন্যায় করলে তাদের জরিমানা দিতে হবে। এ বছরই ৬ই ফেব্রুয়ারী হতে কলকাতায় পুলিশী ব্যবস্থার সূত্রপাত। কাউন্সিল ১৭০৫-এ একজন প্রধান পিয়ন, ৪৫ জন পিয়ন, ২ জন চৌবদার এবং ২০ জন গুয়ালিকে নিয়োগ করবার আদেশ দেয়। ১৭০৫-এ এসব পদে লোক নিয়োগ করা হল। কিন্তু চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার ক্ষেত্রে এই স্বল্প সংখ্যক কর্মচারী ব্যর্থ হওয়ায় কোম্পানী আরও ৩১ জন পাইককে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য বিষয়েও কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডাঃ ওয়াগনকে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবার জন্য একজন সার্জন নিয়োগ করা হয়।

কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি ঘটে। ১৭০৬-এ কোম্পানী কলকাতা বন্দর হতে ৫৯৮৬১৫ টাকার দ্রব্যাদি রপ্তানি করে। এতদিন মূলধনের অভাব ছিল। সে সমস্যাটা মিটলো। জগৎ শেঠের সাথে কোম্পানীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক চালু হওয়ায় কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলধনের কোন অসুবিধা থাকলো না। জগৎ শেঠরা ৯% সুদে কোম্পানীকে টাকা ধার দিতে রাজী হলো। বিদেশীদের সাথে দেশী মহাজনদের এভাবে ঐক্য স্থাপিত হলো।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালফ শেলডন কলকাতার কালেক্টর নিযুক্ত হন। নন্দরাম সেন জেনারেল সুপারভাইজার পদে কালেক্টরী দপ্তরে কাজ করতেন। অর্থ তছনছ করার অপরাধে তাকে পদচ্যুত করা হয়। কাউন্সিলের আদেশে তার কারাদণ্ড হয়। শেষ পর্যন্ত টাকা ফেরৎ দিয়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। নন্দরামই অর্থ তছনছের জন্য ইংরেজদের কাছে অভিযুক্ত কলকাতার প্রথম ব্যক্তি। ১৭০৭-এ এই ঘটনা ঘটেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আশার আলোক দেখতে পান। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বন্দর হতে মোট

৪৮১৩৬০ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হয়। ১৭০৯তে এই পরিমাণ ছিল ৮৪১৭৭৬ টাকা। আরও একবছর পরে এই পরিমাণ বেড়ে ১৩৯০৫৫২ টাকায় দাঁড়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে কলকাতায় ইংরেজদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রত্যেক নাগরিকের ভারতে ব্যবসা করার অধিকার আছে। তাই আর একটা কোম্পানী তৈরী হলো। শেষ পর্যন্ত ১৭০৯-এ তুটো কোম্পানী মিলে একটা কোম্পানী তৈরী হয়। এই কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত হয়।

কলকাতায় তখন পানীয় জলের অভাব ছিল। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লালদীঘি সংস্কার করা হলো। শ্যামরায় ও তার পরিবারবর্গ কালীঘাট চলে গেলেও দোলের সময় প্রতি বছর লালদীঘিতে আসতেন। আবির ও লালরঙে দীঘির জল লাল হয়ে যেতো বলেই দীঘিটার নাম লালদীঘি হয়।

একবার দোলখেলার সময় ইংরেজদের সাথে শ্যামরায়দের বিবাদ হয়েছিল। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারী তখনও বর্তমান। ওখানে কাজ করতেন এণ্টনী ফিরিঙ্গি। জোব চার্ণক চাবুক মেরে এণ্টনীর দেহ ক্ষতবিক্ষত করেন। এ বছর যে লালদীঘি সংস্কার করা হলো তা ১৭০৭ পর্যন্ত ছোট একটা পুকুর ছিল। লালদীঘি সংস্কার করার পর তার চারপাশে বাগান তৈরী হলো। সাহেব-মেমদের আমোদ-আহ্লাদ ও অবসর বিনোদনের স্থানে পরিণত হল লালদীঘি এলাকা। দেশীয়দের কাছে এই এলাকা নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত হলো। আর এই সময় হতেই 'নেটিভ' কথাটার উৎপত্তি।

১৭১০-এ কোম্পানীর কর্মচারীদের চারিত্রিক অধঃপতন ও তুর্নীতির জন্য কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভা উদ্বেগ প্রকাশ করে। একজন ইংরেজ ও একজন দেশীয় ব্যক্তি মিলে কোম্পানীর অর্থ তছনছ করেন। এদের নাম পে মাষ্টার জোসিয়া চিট্টি ও গণেশরাম। এদের তুজনকেই শাস্তি দেওয়া হয়। নন্দরাম সেনের তুর্নীতির পর আবার বড় রকমের তুর্নীতি এ বছরে ঘটলো। একজন স্বদেশী ও একজন বিদেশী মিলে তুর্নীতির ইতিহাস এ সময়কার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শ্রেণীস্বার্থ স্বদেশী-

বিদেশী মানে না। এ ঘটনা তা প্রমাণ করে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কাজ ১৭১০ এ শেষ হলো। নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। দুর্গ হতে জলদরজার মাধ্যমে নদীতীর পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা ছিল। হেয়ার স্ট্রীট পর্যন্ত বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হলো। এখানে একটা রাস্তা তৈরী হলো। এই রাস্তার নাম চার্চ লেন। চৌধুরীদের কাঁচা বাড়ীতে প্রথমে কাগজ-পত্র থাকতো। পরে তাদের পাকা বাড়ীতে কাগজ-পত্র রাখার ব্যবস্থা হয়। এই পাকা বাড়ীটা এবছরে ভেঙ্গে ফেলা হলো। কলকাতার মানুষেরা-দুর্গ দেখে অবাক হন। তাদের ধারণা জন্মালো যে ইংরেজরাই শোভা সিংহের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হতে তাদের বাঁচাতে সক্ষম।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে হক কোম্পানীর জমিদারীতে একটি বাজার তৈরী করেন রাজারাম মল্লিক। কলকাতায় ইহার পূর্বে চণ্ডী বাজার ও সন্তোষ বাজার নামে দুটি ছোট বাজার ছিল। রাজারাম স্থাপিত বাজার আকারে বড় ছিল বলেই বড়বাজার নাম হয়। শ্যাম রায়দের দোল-খেলায় রাস্তাঘাটও লাল হয়ে যেত। এভাবেই লাল বাজারের উৎপত্তি। আর শ্যামরায়ের স্ত্রী রাধার নামানুসারেই রাধাবাজার নাম হয়েছে। লালবাজার ও মিশনরোর সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি বাড়ীতে ছিল রাষ্ট্রদূত ভবন। সেখানে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের এক দূত কয়েকদিন থেকেছেন। এই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় আসেন। রাধাবাজার, লালবাজার, পারস্য দূতের ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় দিনযাপন সে সময়কার কলকাতার বাড়বাড়ন্ত চেহারাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলায় ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধিতে দিল্লীর সম্রাট উৎকণ্ঠিত হন। কোম্পানীর উপর বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধ জারী করা হলো। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বণিক সভার মুখপাত্র নম্রভাষায় লিখিত এক আবেদন-পত্রে বাদশাহের কাছে দয়া ভিক্ষা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে কোম্পানীর লাভও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭১৩-তে কলকাতা বন্দর হতে ১৩৯৬৮৪৩ টাকার দ্রব্য রপ্তানি করে। কিন্তু কর্মচারীদের উপর কোম্পানীর শোষণ অব্যাহত থাকে। যদিও কোম্পানীর কর্ম-চারীরা এদেশে এসে বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন তবু তাদের অনেক

অসুবিধা ছিল। তাদের ভাল বাসস্থান ছিল না। তারা 'লাড রো' নামক গৃহে বাস করতেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এবছর ব্যয়সংকোচ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই কর্মচারীদের খাবার টেবিল তুলে দেয়। এতে কর্মচারীরা ক্ষিপ্ত হলো ঠিকই, কিন্তু তাদের করার কিছু ছিল না।

কথায় বলে বসতে পারলেই শুতে চায়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ১৭১৪-তে সুরম্যানকে ফারুকশায়ারের কাছে আরও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে দিল্লী পাঠান। এডওয়ার্ড ষ্টিফেনশন ও হ্যামিলটন তার সাথে ছিলেন। তারা ১৭১৫তে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন নিয়ে দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু কোন প্রকার সুযোগ মিললো না। কোম্পানী ১৭০৯ হতে ১৭১৮ পর্যন্ত বাংলায় ৪১টি জাহাজ এবং ১৭১৬তে ৪টি নতুন জাহাজ বাণিজ্যিক প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। তা সত্বেও আরও বাণিজ্যিক প্রসার প্রয়োজন। লোভের একটা সীমা থাকা উচিত। কোম্পানীর ভাগ্য ভাল। দিল্লীর বাদশাহের কাছে উপঢৌকন ও শুল্কই হল মূলকথা। তাই ১৭১৭তে কোম্পানী তার ঈপ্সিত ফরম্যান লাভ করলো। মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে এই ফরম্যানকে না মানলেও পরে মেনে নেন। অনেকের মতে এই ফরম্যানই ভারতের পরাধীনতাকে ডেকে এনেছিল। ফরম্যান লাভের পর কোম্পানী কলকাতা সংলগ্ন ৩৮টি গ্রামের জমিদারী কিনবার চেষ্টা করে। বাংলার সুবাদারের বাধার ফলে তা সম্ভব হলো না। কিন্তু গ্রামগুলোর উপর কোম্পানী অধিকার বজায় রেখে চলে। গায়ের জোরে গ্রামগুলোর প্রকৃত মালিকের ভূমিকা কোম্পানী পালন করতে থাকে।

১৭১৮তে মোগল সাম্রাজ্যের পরিধি দিল্লী ও তার আশেপাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে কোম্পানী এই দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য তৎপর হয়। ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল একথাটা তাদের বুঝতে আর কোন অসুবিধা থাকলো না। তাই ১৭১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন পদে অসংখ্য কর্মচারী নিয়োগ করা হলো। সেনা বাহিনীতে ভারতীয় ও পর্তুগীজদের সংখ্যা বেশী হলেও ঐ বিভাগের বড় বড় পদে ইংরেজরাই

ছিলেন। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারকে এই নীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল।

কোম্পানীকে অনেক কৌশল অবলম্বন করে বরাবর চলতে হয়েছে। ১৭২০তে মিঃ ফ্রাঙ্ক জমিদার নির্বাচিত হবার পর জমিদারী সংক্রান্ত পদগুলো থেকে মুসলমানদের ছাটাই করে হিন্দুদের নিয়োগ করেন। কৃষকদের সুবিধার জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য এ সময়েই আমিল নামক পদের সৃষ্টি। সুবাদারদের বে-আইনী কাজকর্মের দিকে মিঃ ফ্রাঙ্ক নজর দেবার ফলে জমিদারী ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। নবাবের জমিদারী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করলেও নিজেদের জমিদারীর খাজনা জায়গীরদারদের দেবার ক্ষেত্রে ছিল চরম অনীহা। ১৭২১-এ কোম্পানী খাজনা দিল মাত্র ১৬৪৮ টাকা। 'মুর্শিদকুলী খাঁ অত্যাচারী নবাব'—১৭২২-এ কোম্পানীর এরূপ প্রচার তাৎপর্যপূর্ণ। জেমস্ গ্রান্ট বলেন যে মুর্শিদকুলী খাঁ বছরে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন এবং দিল্লীতে বছরে ২৫ কোটি টাকা পাঠান। আসলে হিন্দুদের কাছে মুর্শিদকুলী খাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। কলকাতার আসার পর হ'তেই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করার কৌশল নিয়েছিল ইংরেজরা।

আলেকজাণ্ডার ডাও'র লেখা হিন্দুস্থান ১ম খণ্ড নামক পুস্তক হতে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান ও ঢাকার মধ্যে যে রাজপথ ছিল সে তথ্যও যেমন জানা যায় অপরদিকে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য ৩০ হাজার মানুষ জলপথে বিভিন্ন কাজকর্মে এ বছর নিযুক্ত ছিলেন সে তথ্যও জানা যায়। গঙ্গা নদীর মাধ্যমেই খাদ্যদ্রব্য, শিল্পের কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আবার কলকাতার ভূমিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিল বলেই ১৭২৩-এর বাণিজ্য ১৭৪৬০৯৬ টাকা হতে কলকাতা বন্দর মারফৎ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২৪-এ ১৮০৯৫৬০ টাকায় দাঁড়ায়, অবশ্য ১৭২৫-এ এই রপ্তানি বাণিজ্যের পারমাণ হঠাৎ কমে ১৫২৮৯৩৬ টাকা হওয়ায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তোলে। কোম্পানীর সতর্কতার ফলে কলকাতা বন্দর মারফৎ

রপ্তানি-বাণিজ্য পরের বছরে ১৭২৬-এ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৩১৭৯২ টাকায় দাঁড়ায়। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্যই বিস্ময়কর।

সম্রাট প্রথম জর্জের সনদ অনুসারে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় মেয়র কোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মেয়র ও অল্ডারম্যানরা এই কোর্টের দায়িত্ব পেলেন। ১৭২৬-এ মেয়র ও ৯ জন অল্ডারম্যানের মধ্যে ৭ জন ছিলেন খাঁটি ইংরেজ ও ২ জন ছিলেন মিত্র রাজ্যের প্রজা। এ বছরের রাজকীয় সনদ হতে জানা যায় যে লর্ড সলস্ব্যারী প্রথম মেয়র ছিলেন। টোমান ব্রাজিল, জন বংকেট, টোমাস কলিস, টমাস কুক, হেনরী থারনেট, রবার্ট ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, জর্জ নেটি, অলিভার কাউন্ট, জেমস নেভিস মারচ্যাণ্ট প্রথম অল্ডারম্যান ছিলেন।

এ সময় সাধারণ আদালতগুলো মোগলরা নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৬৯৮ হতে ১৭২৬ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে কোম্পানী মোগলদের অধীনে নিজেদের কর্মচারীদের বিচার করতেন। মেয়র আদালত স্থাপিত হওয়ায় ইংরেজরা জোরপূর্বক কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পায়। সমস্ত প্রস্তুতিপর্ব ১৭২৬-এ শেষ হলেও মেয়র আদালত বা 'ওল্ডকোর্ট' ১৭২৭-এর ডিসেম্বরে চালু হয়

মেয়র কোর্টের বাড়ী বেরিয়ার সাহেব তৈরী করেন। বর্তমান বিবাদী বাগের পূর্বদিকের রাস্তা হেমন্ত বসু সরণীর নাম কয়েক বছর পূর্বেও ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট বলে পরিচিত ছিল। এই রাস্তার পূর্ব দিকে ১৭২৮ হতে ১৭৩৫ পর্যন্ত লালবাজার ও মিশন রোর সংযোগ স্থলে রাষ্ট্রদূত ভবনে এই কোর্ট অবস্থিত ছিল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫৬০ টাকায় নীলামে তা বিক্রী হয়। ঐ সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে চ্যারিটি স্কুল ছিল। এই গৃহের দোতালায় মেয়র আদালত চলে যায়। লোকে এই গৃহকে ওল্ড কোর্ট হাউস বলতো। এই গৃহের টাউন হলে সে সময় সভা-সমিতি হতো। মেয়র আদালতের প্রথমে ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। শেষ পর্যন্ত ভাড়া ৮ শত টাকায় দাঁড়ালো।

কলকাতার ইতিহাসের সাথে সুদীর্ঘদিন সম্পর্কযুক্ত হলওয়েল ১৭৩২-এ কলকাতায় আসেন। তিনি পৌর ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ দপ্তরের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ১৭৩৩, ১৭৩৫ ও ১৭৩৬-এর কলকাতার

জনসংখ্যা দেখান। ১৭৩৫-এ ৩২০৭৯০৪ জন ও ১৭৩৬-এ ৩২৬৮৪০৮ জন ছিল কলকাতার লোকসংখ্যা। এই দু বছরের জনসংখ্যা হবে ১৭৩৪ এর জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। ঐ সময়ে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা মোটামুটি একই হারেই হতো।

ওল্ডমিশন চার্চের উত্তরপূর্ব কোণে বড় একটা তেঁতুলগাছ ছিল। ১৭৩৭ এর প্রচণ্ড ঝড়ে উহা ভেঙে যায়। বর্তমান সুবোধমল্লিক স্কোয়ারের কাছে ক্রীকরো অবস্থিত। ১৭৩৭ এর পূর্বে ক্রীকরো হতে হুগলী নদী পর্যন্ত একটি খাল ছিল। হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, বেন্টিক ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে তা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে মিশে আবার ক্রীকরো হতে বেলেঘাটার সল্টলেক বা ধাপা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একে ক্রীক খাল বলা হতো। হুগলী নদীতে উহার মোহনা কলভিন ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট বলে পরিচিত ছিল। ১৭৩৭-র ৩০শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় যে প্রচণ্ড ঝড় ও ভূমিকম্প হয় তাতে হুগলী নদী হতে অসংখ্য নৌকা বাতাসের তীব্র গতিতে এই খালে প্রবেশ করে। নৌকাগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেই থেকে ঐ খালের নাম ডিঙ্গীভাঙ্গা বা নৌকা ভাঙ্গা খাল হয়। কলকাতা তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। ঝড় ও ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষতি হল শিশু কলকাতার। কলকাতার বাড়বাড়ন্তের সাথে ঐ খাল ভরাট করা হলো। হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট এখনও খালটির অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

এ বছর হলওয়েল কলকাতা কর্পোরেশনের আল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। ওল্ডকোর্ট হাউসও এ বছরের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু এই ঝড়ে গোবিন্দরাম মিত্রের খুবই উপকার হয়েছিল। বারাকপুরও চার্ণকের কাছাকাছি একটি গ্রামে ১৬৮৬-৮৭-এর পূর্বে গোবিন্দরাম মিত্র বাস করতেন। তখন তাঁর বয়স কত ছিল জানা যায় না। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন। সামান্য ইংরেজীও জানতেন। ফলে জোব চার্ণকের কুঠীতে তাঁর একটি চাকরী হয়ে গেল। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মদক্ষতার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই গোবিন্দরাম বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৬৮৬-৮৭তে তিনি গোবিন্দপুরে এসে বাস করতে থাকেন। এইস্থানে বর্তমানের ফোর্ট উইলিয়াম অবস্থিত। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম

তৈরী হবার কিছু পূর্বে গোবিন্দরাম সপরিবারে কুমারটুলিতে বাস করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে গোবিন্দরাম কোম্পানীর কালা ডেপুটি, নায়েব জমিদার বা মেয়র বলে পরিচিত হন। জমিদার হলওয়েলের সহকারীরূপে তাকে কাজ করতে হয়েছে। গোবিন্দরামের সততা সম্পর্কে কোম্পানীর কর্মচারীদের সন্দেহ হলে ১৭৩৮-এর পূর্বের কাগজপত্র ঝড়ে উড়ে গেছে বলে তিনি জানান। এবং পরবর্তী বছরের কাগজপত্র ওই নৌকায় নষ্ট করেছে। হলওয়েল কোম্পানীকে জানান যে গোবিন্দরাম কমপক্ষে দেড়-লক্ষ টাকা তছনছ করেছেন। হলওয়েলের অভিযোগ অনুযায়ী ১৭৪৮-এ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হলেও গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হল না।

নাদিরশাহ ১৭৩৯-এ দিল্লী আক্রমণ করেন এবং ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন চালান। আহম্মদশাহ দুরাণীও দিল্লী আক্রমণ করেন এই বছরেই। এই দুই আক্রমণে দুর্বল দিল্লীর শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়লো। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজরা ভারতে শিকড় গাড়বার পথ পরিস্কার করতে থাকে। দিল্লীর সম্রাটের তালমাতাল অবস্থা কলকাতার কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মনেও এ বছর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। কলকাতা বন্দরে জাহাজ নোঙর করার যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। এ বছরে ইংরেজদের ৪২টি, ফরাসীদের ২০টি, ওলন্দাজদের ২টি এবং অন্যান্যদের ১২খানি জাহাজ কলকাতায় আসে, এবং যথাক্রমে ৩৮টি, ২৬টি, ২টি এবং ১২টি জাহাজ ফিরে যায়। কলকাতা বন্দরে জাহাজ-গুলোর আসা-যাওয়ার ঘটনা হতে কলকাতার বাণিজ্যিক গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কোম্পানীকে বাণিজ্যিক মুনাফালাভের জন্য দুদিক থেকে লড়াই করতে হয়েছে। একদিকে অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে বাংলার নবাবের সাথে ১৭৪১-এ বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বছরে বাংলায় ফরাসীদের বাণিজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৫৩-এর পরে

ফরাসীদের এবং ১৭৫৪-এর পরে দিনেমাররা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতা হতে একেবারে হটে যায়। সঙ্গত কারণেই কলকাতা বন্দর মারফৎ এ বছরে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯১৯১১২ টাকাতে পৌঁছায়।

কলকাতার লোকসংখ্যা ১৭৪২-এ বৃদ্ধি পেল দ্রুতগতিতে। সিমলা, বনবনিয়া, আরকুলি, মীর্জাপুর, তালতলা, উল্টাডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, সুতানুটি প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মারাঠা খাল এ বছরে খনন করা হলো। প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল ইংরেজ দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত কলকাতার নিরাপত্তা বেশী। এ কারণেই লোকসংখ্যা কলকাতায় হঠাৎ বৃদ্ধি পেল। ১৭৪২-এ কাটা খাল বা পরিখাকেই মারাঠী খাল বা মারাঠা ডিচ্ বলে।

মারাঠা খাল কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ সময় কলকাতায় হৈ-চৈ পড়ে যায়। খালের পাশে যে মাটি জমেছিল সেই মাটি লেবেল করার ফলে রাস্তা তৈরী হলো। রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হলো। গাছ লাগানোর ফলে কলকাতার পরিবেশ সুন্দর হয়ে উঠলো। যারা কলকাতায় এসে আশ্রয় নেন তারাই খাল কাটার কাজে অংশগ্রহণ করেন। শ্যামবাজারের কাছে এই খাল এখনও বর্তমান। পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত এই খাল বিস্তৃত ছিল। কলকাতার উন্নয়নের সাথে সাথে এই খালের বেশীর ভাগটাই ভরাট করা হয়েছে। মারাঠা খালকেই ইংরেজীতে মারাঠা ডিচ বলে।

১৭৪২, ১৭৪৩ ও ১৭৪৪-এ কলকাতার বাড়ীর সংখ্যায় কোন হেরফের নাই। ১৭৪৪-এ কলকাতায় বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১৪৮৬৮টি। অবশ্য কাঁচা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। উইলসন ও হলওয়েল ১৭৫২তে কলকাতার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩১৪৫৮০ ও ৪০৯০০০ জন দেখান। অন্যদিকে ১৭৪২-এর মানচিত্রে কলকাতায় ১৭৪২ একর জমি দেখানো হয়েছে। প্রতি একরে গড়ে ২ শত লোক বাস করলে লোকসংখ্যা উপরোক্ত দুটি তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী। বাণিজ্যই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই তাদের বাণিজ্যের পরিচয় ও বাণিজ্যের

প্রসার কলকাতার অগ্রগতির ইতিহাস হতে বিচ্ছিন্ন নয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭৪৫-এ কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্য কলকাতা বন্দর মারফৎ কিছুটা কমে যায়। এ বছর রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৩৫৯৩২১৬ টাকা। পরের বছর ১৭৪৬-এ এই পরিমাণ ৩৯৩৫৯৪৩ টাকা হল। আবার ১৭৪৭-এ তা ৩৬৮৫৫২০ টাকায় দাঁড়ায়। এই পরিমাণ ১৭৪৬ হতে কম হলেও ১৭৪৫ হতে বেশী। প্রতি বছর কোম্পানীর রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যেই অধিকাংশই ছিল বস্ত্রখণ্ড ও কাঁচারেশম। মাঝে মাঝে দু-একবছরে রপ্তানির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছর হতে কিছু বেশী-কম হলেও ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে কোম্পানীর উত্তরোত্তর রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রগতি একদিকে কোম্পানীর কলকাতার বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধিকে প্রমাণিত করে এবং অপরদিকে ইউরোপীয় বাজারে বস্ত্রখণ্ড ও রেশমের অফুরন্ত চাহিদাকে প্রমাণিত করে।

এই রপ্তানির মূল্য ১৭৪৮, ১৭৪৯ ও ১৭৫০-এ পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৩০৩৪৭৩৬ টাকা, ২৬৪২৮৮০ টাকা, ৪০৮৯৪১৬ টাকা। এই তিন বছরের গড় ১৭০৮-এর রপ্তানি বাণিজ্যের ৬½ গুণ। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তাই এবছর হতে ভারতে কোম্পানীর গুরুত্ব বিশেষ করে অনুভব করতে থাকে।

কলকাতার কালীঘাটের মন্দির এযুগেও দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে আকর্ষণের বস্তু। ১৭৫১তে গোকুলচন্দ্র হালদার নামক এক সেবাইত নবাব আলীবর্দী খাঁর দানগ্রহীতারূপে হালদার উপাধী লাভ করেন। ইনি ভবানীদাসেব ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে আলীবর্দী খাঁ হিন্দু বিদ্বেষী নন—একথা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যেই কালিঘাটের মন্দিরের সেবাইতদের হালদার উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দরাম দুর্নীতিপরায়ণ হলেও বহু জনহিতকর কাজ করে কলকাতায় বিখ্যাত হন। তিনি চীৎপুরে মহাদেবের নামে উৎসর্গিত নটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতিপরায়ণ গোবিন্দরাম মিত্রের শিক্ষা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য সেযুগে তাকে কলকাতার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সারা জীবন যে ব্যক্তি ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না তাঁরই একখানি চিঠি তখনকার যুগের অর্থ নৈতিক

অবস্থার এক সঠিক চিত্র আমাদের কাছে পৌছে দেয়—একথা কম বিস্ময়ের নয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা এটা।

সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের ১৭৫৩-এর ৮ই জানুয়ারীর চার্টার অনুযায়ী মেয়র আদালত ব্যতীত কোর্ট অফ রিপেণ্টস্ নামক দেওয়ানী আদালত কলকাতায় স্থাপিত হয়। এই আদালত ছোট ছোট মামলার বিচার করতো। কলকাতার বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই কোর্টের আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কোম্পানীর কলকাতা তথা বাংলার প্রভাব বৃদ্ধি ১৬৯০-এর পর হতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৫৪তে কলকাতার কোম্পানীর পক্ষে একথা ভাবা অযৌক্তিক ছিল না। সমস্যা কমলেই ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যে সমস্ত রাইটাররা কাজ করতেন তাদের বেতন ভাল ছিল না। তাই তারা যাবতীয় খরচ কোম্পানীর উপরই চাপাতেন। শেষ পর্যন্ত রাইটারদের খরচ সামলাতে কোম্পানীকে হিমসিম খেতে হয়। রাইটারদের অমিতব্যয়ীতা সহ্য করা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধ্য হয়েই কোম্পানী রাইটারদের সম্পর্কে বিলেতে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়। ঐ চিঠির উত্তরে ১৭৫৪তে বিলেতের কোর্ট অফ ডাইরেক্টররা জানান যে কোনমতেই রাইটারদের অমিতব্যয়ীতা সহ্য করা হবে না, তাদের বুঝিয়ে বলার জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মরত অবস্থায় কোন রাইটার কোম্পানীর গাড়ী ব্যবহার করলে তাঁকে পদচ্যুত করা হবে একথাও জানানো হয়। এসব নির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় রাইটারদের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না।

১৭৫৫ হতে ভারতীয়দের বিচার করার ক্ষমতা মেয়র কোর্টের থাকলো না। জমিদার বা কলকাতার কালেক্টর কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী। কোম্পানীর কনিষ্ঠ সদস্যদের উপর কোম্পানী এলাকায় যারা বাস করতেন তাদের মামলা নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কোম্পানীর নিজস্ব কাছারী ছিল। কাল জমিদার নামে একজন এদেশীয় ব্যক্তি জমিদারকে সাহায্য করতেন। মেয়র ও অল্ডারম্যানরা কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী হলেও একবার অফিসে বসতে পারলে

তাঁদের পদচ্যুতি করা শক্ত ছিল। তাই তাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। তাদের সজ্জা ছিল অপরূপ। মেয়র ভেলভেটের চেয়ারে বসতেন। অল্ডারম্যানরা পরতেন ভেলভেটের গাউন।

বিভিন্ন কারণে সিরাজের ইংরেজদের উপর রাগ ছিল। প্রথমতঃ সিরাজ নবাব হবার পর ইংরেজরা তাঁকে কোনরূপ উপঢৌকন পাঠায়নি। দ্বিতীয়তঃ নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কোম্পানী আশ্রয় দেয়। নবাবকে বার বার অনুরোধ জানানো সত্বেও কোম্পানী তাকে সমর্পণ করেনি। তৃতীয়তঃ এ সময় ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ চলার ফলে বাংলাতেও ইংরেজ-ফরাসী দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলার মধ্যে এই অশান্তি সিরাজের পছন্দ হয়নি। চতুর্থতঃ কোম্পানীকে নিষেধ করা সত্বেও কোম্পানী দুর্গ নির্মাণ, অস্ত্র সংগ্রহ, সৈন্যদল গঠন প্রভৃতি কাজ অব্যাহত রাখে। ফরাসীরা সিরাজের কথা শুনলেও ইংরেজরা শুনলো না।

সিরাজদ্দৌল্লার ইতিহাস কলকাতার ইতিহাস হতে বিচ্ছিন্ন নয়। জোব চার্ণক ও লর্ড ক্লাইবের পাশাপাশি সিরাজদৌল্লা ও মহারাজ নবকৃষ্ণ চৌধুরীর জীবনকথা বাদ দিয়ে কলকাতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সিরাজের নাম ছিল মীর্জা মহম্মদ। আলিবর্দীর ইচ্ছানুযায়ী সিরাজ সিংহাসনে বসেন। আলীবর্দীর প্রথমা কন্যা ঢাকার নবাবের বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম ছিলেন সিরাজের সিংহাসনের দাবীদার। সিংহাসনের ব্যাপারে ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজরা চক্রান্ত আরম্ভ করলে সিরাজ কৌশলে ঘসেটি বেগমকে নিজের কাছে যান। এতে ইংরেজরা বুঝতে পারলো যে তাদের কৌশল ধরা পড়ে গেছে। ইংরেজরা তাদের এই কাজের জন্য অপরাধ স্বীকার করলো কিন্তু দুর্গ নির্মাণ বন্ধ হলো না। সিরাজ দুর্গ ভাঙ্গার আদেশ দিলেও ইংরেজরা ভ্রূক্ষেপ করলো না। তাই কলকাতা জয় করার সিদ্ধান্ত নেন সিরাজ। নবাব সিরাজদ্দৌলা তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ও নির্মম হলেন।

ইংরেজদের সাহস ও স্পর্ধা সিরাজের কাছে অসহ্য বলেই দেশপ্রেমিক সিরাজ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন বুধবার বাগবাজারে সৈন্যদল নিয়ে পৌছান। বিচক্ষণ সিরাজ বাংলার ভাগ্যাকাশে অশুভ সঙ্কেত দেখতে

পান বলেই যুদ্ধকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। অনেক দেরী হলেও সিরাজের কলকাতা অভিযান কলকাতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রথমে বাগবাজারের রক্ষণ প্রাচীর হতে অবিশ্রান্ত কামানের গোলার মুখে ১৬ই জুন সিরাজের সৈন্য দাঁড়াতে না পেরে দমদমে পালিয়েছিল। ইংরেজরা ১৪ই জুন হতে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেছিল। সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারী এমনকি গীর্জার চ্যাপলেন ম্যাপলেটফ্টও বাদ গেলেন না। প্রত্যেকেই কোন না কোন দায়িত্ব পান। ইংরেজরা ১৭ই জুন দুর্গের চারপাশের হাটবাজারগুলো নষ্ট করেছিল। সিরাজের সৈন্যরা যাতে খাদ্য না পায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা একাজ করেছিল। এসব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৮ই জুন নবাব-সৈন্য শহরের চারদিক ঘিরে ফেললো। দুর্গের আশে পাশের এমনকি গীর্জার লোকেদেরও ইংরেজরা দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। ফলে পরিত্যক্ত বাড়ীগুলোর ছাদে কামান বসানোর ক্ষেত্রে সিরাজের কোন অসুবিধা হয়নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান হাউসে ১টি, গভর্ণমেণ্ট প্লেসের মিলনস্থলে ১টি, ওল্ড কোর্ট হাউস ও গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের কাছে ২টি, ক্লাইভ স্ট্রীটে ১টি, হেষ্টিংস হাউসে ১টি এবং কাউন্সিল হাউসে ১টি তোপমঞ্চ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদের পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

ইংরেজরা এই যুদ্ধে চরম নাজেহাল হয়। দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেবার পর দুর্গের দ্বার বন্ধ করা হলো। হলওয়েল ১৮ই জুন রাত ১১টায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের দুর্গের দূরে রক্ষিত জাহাজে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। গভর্ণরের পত্নী রোজার ড্রেকও এই দলে ছিলেন। ১৭৩১-এ কলকাতা কাউন্সিলের যিনি সদস্য ছিলেন সেই ফ্রান্সিসের স্ত্রী লেডী রাসেলকে কলকাতা পালাতে হয়েছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুসহ জাহাজটি কলকাতার ৩০ মাইল দক্ষিণে ফলতায় গিয়ে অবস্থান করলো। সেখানে ছমাস অনেকেই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটান।

২০শে জুন, ১৭৫৬ ইংরেজদের কাছে চরম বিপর্যয়ের দিন। বেলা ১২টা পর্যন্ত ৫০ জন আহত সৈন্য ও ১৫০ জন সুস্থ সৈন্য বাদে সবারই মৃত্যু হয়েছিল। এদিনই ইংরেজ দুর্গের পতন ঘটলো। কলকাতার ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখলেন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা।

যুদ্ধ থামাবার জন্য হলওয়েল নবাব সৈন্যদের বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউ কারও কথা শোনেনি। যুদ্ধের গতি নবাব সৈন্যরাও বৃদ্ধি করার ফলে প্রতিরোধের বদলে আত্মরক্ষার প্রশ্নটাই ইংরেজদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। নবাব সৈন্যরা যখন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলো তখন ইংরেজ সৈন্যরা মদের বোতল নিয়ে ব্যস্ত। ইংরেজ সৈন্যদের এই অবস্থা দেখে নবাব সৈন্যরা আর রক্তপাত করলো না। তারা সামান্য ধনসম্পদই পেয়েছিল। ইংরেজরা পালাতে পারতো, কিন্তু না পালিয়ে তারা আত্মসমর্পণ করলো।

এ সময়কার এক কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। রাত গভীর হলে নবাব সৈন্যরা ১৪৬ জন বন্দীকে বন্দী করেছিল। হলওয়েলের বর্ণনা হতে জানা যায় যে দুর্গের ১২৬ জন বন্দীকে ১৮´× ১৪´ ফুট মাপের একটি ঘরে নবাব সৈন্যরা জোরপূর্বক বন্দী করেছিল। এতে দুটি মাত্র ব্লাকহোল ছিল। হলওয়েলের মতে ২৩ জন বাদে সবাই গরমে ও শ্বাসকষ্টে মারা যান। ইতিহাসে এ ঘটনা অন্ধকূপ হত্যা বলে পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে হলওয়েলের এই কাহিনী মনগড়া। কলকাতার দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে সিরাজদ্দৌল্লাকে হেয় করবার উদ্দেশ্যেই কলকাতার জমিদার হলওয়েল অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী তৈরী করেছিলেন।

কলকাতা দখলের খবর পেয়ে মাদ্রাজ হতে ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতায় আসেন এবং অতি সহজেই কলকাতা দখল করেন। সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু কাশীপুর হতে অগ্রসর হওয়া সিরাজের পক্ষে সম্ভব হল না। ক্লাইব ও ওয়াটসন একদল সৈন্য ও একটি নৌবহর নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামের ছত্রভঙ্গ সৈন্য ও কর্মচারীরা ইতিমধ্যে মনোবল ফিরে পেয়েছে। তাই সিরাজের পতন ঘটে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী রবার্ট ক্লাইভ ও সিরাজের সাথে যে সন্ধি হল তাহা আলি নগরের সন্ধি বলে পরিচিত। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণ করতে পারবে এবং বিনাশুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করতে পারবে এরূপ চুক্তি হয়েছিল।

সিরাজ কলকাতা জয় করে কলকাতার নাম রাখেন আলিনগর।

আলিনগরের সন্ধির পর ক্লাইভের সাহস বেড়ে গেল। সিরাজের বিরুদ্ধে তিনি চক্রান্ত আরম্ভ করেন। মীরজাফর ছিলেন সিরাজের সেনাপতি। আলিবর্দী খাঁর সে ভগিনীপতি। তার সিংহাসনে লোভ ছিল বরাবরই। ক্লাইভ, মীরজাফর, অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ খাঁ প্রভৃতিকে দলে নিয়ে এসে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করেন। ঐ সময় ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলছিল। ক্লাইভ ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর দখল করতে অগ্রসর হন। কিন্তু সিরাজ ক্লাইভকে কোনরকম বাধা দেননি। তিনি কতিপয় ফরাসীদের দরবারে আশ্রয় দেন। ইংরেজরা অনুরোধ করা সত্বেও সিরাজ তাদের ফেরৎ দেননি। ক্লাইভের ধারণা হল যে সিরাজ ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যতে ইংরেজদের আক্রমণ করবেন। তাই ক্লাইভ যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগিরথীর তীরে ক্লাইভ ও সিরাজের মধ্যে যুদ্ধ হল। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ ক্লাইভের সাথে চুক্তি অনুযায়ী সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। মীরমদন ও মোহনলাল অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালান। এই দুজনের যুদ্ধনৈপুণ্য ক্লাইভকে জয়লাভ সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। মীরমদনের যুদ্ধে হঠাৎ মৃত্যু হল। মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ চালান। সিরাজ মীরজাফরকে বার বার যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি শোনেননি। যুদ্ধ তথাপি নবাবের অনুকূলে ছিল। এমত অবস্থায় মীরজাফর সিরাজকে যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করেন। মোহনলাল এতে রাজী হলেন না। সিরাজ দেশরক্ষার জন্য মীরজাফরকে অনুরোধ করেছিলেন, তাই মীরজাফরের যুক্তি সিরাজ মানতে সম্মত হন। নবাবের আদেশ মোহনলালকে মানতেই হলো। যুদ্ধ থেমে গেলে ক্লাইভ প্রচণ্ড বেগে সিরাজের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। সে যুগের যুদ্ধের নিয়ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করে কৌশলে সিরাজকে পরাস্ত করলেন ক্লাইভ। ভাগলপুরের ফরাসী বাণিজ্যকুঠীর অধ্যক্ষ 'মসিয়ে ল'-এর সাহায্য নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ করার ইচ্ছা সিরাজের ছিল। তাই তিনি পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি ধরা পড়েন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেইবছরই বিশ্বাস-

ঘাতক মীরজাফর বাংলার নবাব হন।

১৭৫৭ এর জুলাই মাসে মীরজাফরের সাথে কোম্পানীর চুক্তির মূল কথা ছিল—যারা কোম্পানীর শত্রু তারা নবাবের শত্রু। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল যে ইংরেজদের কাছে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করলে নবাবকে সমস্ত খরচ বহন করতে হবে। ফলে নবাবের উপর কোম্পানীর প্রভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেল। নবাব মীরজাফর কোম্পানীর হাতের পুতুল হলেন।

সিরাজের কলকাতা দখলের ভার সিরাজের কর্মচারী মাণিকচাঁদ আলীনগর বা কলকাতার সর্বময় কর্তা হন। তিনি কলকাতাবাসীর উপর অত্যাচার চালাতেন। ১৭৫৬ এর ২০শে জুন হতে ১৭৫৭ এর ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কয়েকমাসের মধ্যেই কলকাতাবাসী সিরাজের বিশেষ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। আলীনগরের সন্ধি তাদের কাছে আশা ভরসার সৃষ্টি করেছিল। তাই জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন সিরাজকে আবার পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হতে হয়েছিল। মারাঠা আক্রমণের ভয়ে যারা কলকাতায় আশ্রয় নেন তারা সিরাজের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে ইংরেজদেরই সমর্থন করেন। শান্তিতে জীবনযাপনই তাদের কাম্য ছিল। দেশ পরাধীন হল কি হল না এ প্রশ্ন তাদের কাছে গৌণ ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে পরোক্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল বাংলায়। মীরজাফর কোম্পানীর হাতে বাংলার শাসন ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতাগুলো একে একে ছেড়ে দিতে থাকেন। তিনি কোম্পানীর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ব্যাপক লুণ্ঠন আরম্ভ করলো। অনেকের মতে মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হতে মুক্ত হয়ে বাংলা তথা ভারতের মানুষ এক আধুনিক যুগে প্রবেশের সুযোগ পান এই যুদ্ধের ফলে। এসব মতামত নিয়ে তর্কবিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে গেল। মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব খর্ব হলো। হুগলীর পরিবর্তে কলকাতা বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো। অনেকের মতে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ক্লাইভই কলকাতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ হলেন লর্ড ক্লাইভ।

পলাশীর যুদ্ধ কলকাতায় কোম্পানী বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। যে কাজ অতীতে অনেকেই পারেন নি নবাব সিরাজদ্দৌলা তাই পারলেন। এই যুদ্ধের পর কোম্পানীর মনোবল বৃদ্ধি পেল। তাদের আর স্বদেশে চলে যেতে হবে না—ভারত হয়তো তাদের হবে ভবিষ্যত এরকম ক্ষীণ আসা উঁকিঝুঁকি মারতে থাকলো ইংরেজদের মনে। তাই কলকাতার ইতিহাসের সাথে পলাশীর যুদ্ধের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ়।

অন্যদিকে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আজও মীরজাফরের কবরখানার উপর দিয়ে মানুষ ঘৃণাভরে যাতায়াত করেন। স্থানীয় অধিবাসী হতে শুরু করে দেশী ও বিদেশী পর্যটক প্রত্যেকেই নবাব মীরজাফরের কবরখানার উপর দিয়া যেতে হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। মীরজাফর একাই কি বিশ্বাস-ঘাতক? ইংরেজদের সাথে যারা চক্রান্ত করেছিলেন তারা বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পেলেন না কেন?

মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ১৭৫০-এ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ফারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইংরেজীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাই নবকৃষ্ণের কোম্পানীর মুন্সিগিরির কাজ পেতে বেশী দেরী হল না। তিনি ছিলেন ক্লাইভের কূটনৈতিক পরামর্শদাতা। কলকাতা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সিরাজ হালসিবাগে তাবু ফেলেছিলেন। ক্লাইভ বহু উপঢৌকন দিয়ে নবকৃষ্ণকে শিবিরে পাঠান। সমস্ত খবর নিয়ে ফিরলেন নবকৃষ্ণ। এই খবর সংগ্রহ করার ফলেই সিরাজকে ক্লাইভের পক্ষে পরাজিত করা সহজ হয়েছিল। মীরজাফরও ক্লাইভের মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি নবকৃষ্ণের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ নবকৃষ্ণের ইংরেজ প্রীতিকে আরও প্রমাণিত করে। মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধে নবকৃষ্ণ চৌধুরী মেজর অ্যাডামসের সহকারী ছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মূল্যবান সেবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস তাকে সূতানুটির জমিদারী দান করেন। ইংরেজদের বিশ্বস্ত অনুগামী মহারাজ নবকৃষ্ণ আখের গুছাবার উদ্দেশ্যে বহু পূর্ব হতেই পথ পরিস্কার করছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের সাথে ক্লাইভের

চুক্তির ক্ষেত্রে নবকৃষ্ণের ভূমিকাকে ন্যক্কারজনক ভূমিকা বলতে ক্ষতি কি ? পরোক্ষভাবে কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ চৌধুরী কি পলাশীর যুদ্ধের জন্য অন্ততঃ পরোক্ষভাবে দায়ী নন ! বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার অপরাধ মীরজাফরের কেন ? তিনি মুসলমান বলেই কি এই অপবাদ ? ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের বদলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদেরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং ইতিহাসকে তাই বিকৃত করা হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজের কোষাগার হতে আট কোটি টাকা পাওয়া গেল। দেওয়ান রামচাঁদ আর নবকৃষ্ণ চৌধুরী এবং অন্যান্যরা ক্লাইভকে এই অর্থের খবর জানাননি। অনেকের মতে এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পরে নবকৃষ্ণ চৌধুরী তার মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে সমগ্র কলকাতায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। যাট টাকা মাইনের মুন্সীর পক্ষে এই দক্ষযজ্ঞ সম্পন্ন করা কি করে সম্ভব ছিল ?'

মহারাজ নবকৃষ্ণ চৌধুরী কলকাতার আপার চীৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণী হতে পি সি রায় রোড) হতে আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাস্তা তৈরী করেন। এই রাস্তার পূর্বদিকের অংশ বাদে সমস্ত অংশটাই রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট বলে পরিচিত। একজনের কবরের উপর দিয়ে মানুষ ঘৃণাভরে যাতায়াত করেন। আর একজনের নামাঙ্কিত রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াতের সময় গৌরব বোধ করেন। দুশত বছরের বেশী সময় পার হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত এই সত্যটার রহস্য আমরা ভেদ করলাম না। পলাশীর যুদ্ধের জন্য একা মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়, সিরাজের মন্ত্রীমণ্ডলী, পরিষদবর্গ, বাংলার কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাদের অন্যতম ছিলেন কলকাতার শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ চৌধুরী এবং যাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ ই বড় ছিল, দেশের স্বাধীনতা বড় ছিল না তারা সকলেই মীরজাফরের সমতুল্য বিশ্বাসঘাতক। পলাশীর যুদ্ধের জন্য মীরজাফরকে একা বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কলকাতার ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই সত্যকে নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

(১৭৫৮-১৮৫৭)

পলাশীর যুদ্ধের পর হতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত সময়সীমা কলকাতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়। ইংরেজরা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কলকাতার কিছু কিছু উন্নয়ন, শিল্পের প্রসার, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি, সমাজসংস্কার আন্দোলন, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, এবং মানুষের জীবন-জীবিকাকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করেছে। এ সবকিছুই বৃদ্ধি করেছে কলকাতার গুরুত্ব।

পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজের কোষাগারের এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রূপোর টাকা, বত্রিশ লক্ষ সোনার মোহর, দুই সিন্ধুক ভরা সোনা, চার বাক্স হীরে জহরত, দুবাক্স পান্না-চুনী ও আরও মূল্যবান রত্নাদি ক্লাইভ লুঠ করেন। ঐ লুঠের কাজে অংশীদার হলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। আমীর বেগ, রামচাঁদ ও অন্যান্য অনেকেই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতায় কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। অথচ একশো নৌকায় করে লুঠের মাল কলকাতায় এসে পৌঁছালো কলকাতাবাসীর চোখের সামনেই। অন্যদিকে সিরাজকে কলকাতার যুদ্ধের সময় সমর্থন করার মিথ্যা অজুহাতে উমিচাঁদের পুত্র মানিকচাঁদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ১৭৫৮তে ইংরেজরা ফেরৎ দিল, কোন প্রমাণ মেলেনি বলে। ইংরেজরা এজন্য বাহবা অর্জন করেছিল।

নবাব মীরজাফরের কাছ হতে কলকাতা পুনর্গঠনের জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ইংরেজরা আদায় করলো। কলকাতার যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশীয়দের দুলক্ষ দশ হাজারের কিছু বেশী টাকা বন্টন করা হলো। তেরোজন দেশীয় কমিশনার পেলেন প্রায় দুলক্ষ টাকা। এর মধ্যে সিংহভাগ গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক ও রতন সরকারের ভাগে জোটে। দেশীয় কমিশনারদের বশংবদ ছাব্বিশ জন বাকী টাকা পেয়েই ধন্য হলেন। এভাবে ইংরেজরা কলকাতায় তৈরী করলো একদল

পেটুয়া মানুষ। নতুন করে দুর্নীতি ও স্বার্থপরতা কলকাতার বুকে জন্ম নিল।

ক্লাইভ সিরাজ কর্তৃক বিধ্বস্ত দুর্গ ১৭৫৮তে নতুন করে গোবিন্দপুরে তৈরী শুরু করেন। গোবিন্দপুরের মানুষেরা অন্যত্র উঠে গেলেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের নামানুসারে দুর্গের নাম হল ফোর্ট উইলিয়াম। ১৭৭৩-এ দুর্গের কাজ শেষ। এটাই হলো বর্তমানের ফোর্ট উইলিয়াম।

মীরজাফরের পক্ষে ইংরেজদের তাঁবেদারী করা সম্ভব হলো না বলে ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে তিনি ইংরেজদের তাড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৫৯-এ বিদারার যুদ্ধে ক্লাইভ মীরজাফর ও ওলন্দাজদের পরাজিত করেন। মীরজাফরের নবাবী গেল। মীরকাশিম ১৭৬০-এ নবাব হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পূর্বেই পেয়েছিল। এ সময় অন্য ব্যবসায়ীর অন্তর্দেশীয় পণ্যকেও নিজেদের পণ্য বলে চালাবার ফলে নবাবের রাজস্ব কমে যায়। ইংরেজদের হাতেই রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতা একথা বুঝতে মীরকাশিমের দেরী হলো না। সামরিক খাতে বেশী অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনে মীরকাশিমকে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হলো। একদিকে কোম্পানীর গোমস্তাদের অত্যাচার ছিল। অন্যদিকে ১৭৬১তে কোম্পানী প্রবর্তিত রাজস্বনীতি ও নবাবের রাজস্ব বৃদ্ধি বাংলার মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

ঐ সময় কোম্পানী কর্তৃক বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার পরিচয় পত্রকে দস্তক বলা হতো। দেশীয় ব্যবসায়ীরা নবাবকে শুল্ক দিলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হয়। ফলে ইংরেজদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতায় হটে যেতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মীরকাশিম এ ব্যাপারে কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে অভিযোগ করেন। গভর্ণর কোম্পানীর কর্মচারীদের শুল্ক দেবার কথা বললেও বাস্তবে শুল্ক আদায় হলো না। ইতিমধ্যে মীরকাশিম দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ হতে ফরমান লাভ করে বৈধ নবাব হয়েছেন। তিনি স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন।

শুল্কনীতি নিয়ে কোম্পানীর সাথে মনোমালিন্যের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য

হয়ে পড়ে। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়মালার যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে ১৭৬৩তে মীরকাশিমের নবাবী গেল। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্য নিয়ে ১৭৬৪তে আবার মীরকাশিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলো। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে আসার পর দিল্লীর বাদ্শাহর কাছ হতে ১৭৬৫-তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ বছরই গভর্ণর ও তিনজন সদস্য নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটির উপর ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও রেসিডেন্টের হাতে ২৪টি দেওয়ানী জেলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

ক্লাইভ ১৭৬৫তে লণ্ডনের ডিরেক্টর সভাকে জানান যে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে বছরে ২½ কোটি টাকা আয় সম্ভব। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি না হলেও ব্যবসায়ে উন্নতির ফলে ইংলণ্ড থেকে মূলধন আসা বন্ধ হলো। ব্যবসায়ে উন্নতির ফলেই ১৭৬৬ হতে ১৭৬৮-এর মধ্যে কোম্পানী ইংলণ্ডে ৫·৭ মিলিয়ন মুদ্রা পাঠাতে সক্ষম হয়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭তে স্বদেশে ফিরে যান। কলকাতায় কোম্পানীর গভর্ণর হলেন ভেরলষ্ট।

কোম্পানীর কলকাতায় একটি ক্যান্টনমেন্ট তৈরীর ইচ্ছা ছিল। এ ব্যাপারে মীরজাফরের কাছ হতে ৪ শত বিঘা জমি কেনা হয়েছিল। এতদিন ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভার অনুমতি মেলেনি। ১৭৬৩তে মীরকাশিমের রণসজ্জা দেখে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর ক্যান্টনমেন্ট তৈরীর অনুমতি দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৭৭০ এর মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট তৈরীর কাজ শেষ হয়। ক্যান্টনমেন্ট তৈরী হবার ফলে কলকাতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভারতে বৃটিশ শাসনের সম্ভাবনাকে অনেকেই বাস্তব বলে ধরে নেন। ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বের সম্ভাবনায় দেশীয়দের একাংশ উৎফুল্ল হলেন। তাদের আখের গুছাবার সুযোগই ছিল মূল লক্ষ্য।

১৭৭২-এ ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্ণর হয়ে আসার পর বিচার ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এলো। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাকে

কোম্পানীর অধীনে আনা হলো। প্রত্যেক কালেক্টরীতে মফঃস্বল আদালত স্থাপিত হলো। এর নাম সদর দেওয়ানী আদালত। কলকাতায় এই আদালতের উর্ধতন আদালত স্থাপিত হয়। জেলায় জেলায় ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হলো। রাজস্ব বিভাগেও হলো বিরাট পরিবর্তন। মুর্শিদাবাদ হতে রাজস্ব আদায়ের সদর দপ্তর কলকাতায় আনা হলো।

হেষ্টিংস্ দ্বৈত শাসন রোধ করেন। দিল্লীর বাদশাহের ২৬ লক্ষ টাকা ভাতা তিনি বন্ধ করেন। বাংলার নবাবের ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাকে কমিয়ে করেন ২৬ লক্ষ টাকা। মোগলদের কাছ হতে এলাহাবাদ ও কারা প্রদেশ কেড়ে নেওয়া হলো।

রাজস্ব বিভাগেও বিরাট পরিবর্তন হলো। তিনি রাজস্ব আদায় সুদৃঢ় করার জন্য বোর্ড অব্ রেভিনিউ গঠন করেন। প্রতি জেলায় জেলায় একজন করে দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হলো। এ বছর হতেই কোম্পানীর সদর দপ্তর মাদ্রাজ হতে কলকাতায় উঠে এলো। আর এবছর হতেই কলকাতা বাংলার রাজধানী। কলকাতা নগরীর গুরুত্ব গেল বেড়ে।

১৭৭১-এ কলকাতায় কোষাগার স্থানান্তরিত হলো। জগৎশেঠদের গুরুত্ব কমে গেল। বাংলা ও বিহারকে ১৭৭৩-এ বোর্ড অব্ রেভিনিউর অধীনে আনা হলো। এ বছরেই কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও বর্ধমানকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। রাজস্ব বিভাগের পুনঃগঠনের ফলে কোম্পানীর শাসনকে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করলেন হেষ্টিংস্।

তিনি দত্তক প্রথা লোপ করেন। ১৭৭৪-এর ২৬শে মার্চের তৃতীয় জর্জের রাজকীয় সনদের ফলে গভর্ণর হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হন। তিনিই ভারতে প্রথম গভর্ণর জেনারেল। আর এ বছরই সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এলিজা ইম্পে সহ পাঁচজন ১৭৭৪-এর ২২শে অক্টোবর হতে সুপ্রিম কোর্টের চেয়ারে বসেন।

হেষ্টিংস ১৭৭৬-এ আমিনী কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কাউন্সিল তুলে দিয়ে পুনরায় কালেক্টর পদের প্রবর্তন

করেন। ১৭৭৭-এ পাঁচশালা ব্যবস্থা চালু হলো। আর জেলায় জেলায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলো তুলে দেওয়া হয়। হেষ্টিংস ও চারজন সদস্য নিয়ে সার্কিট কমিটি তৈরী হলো। জেলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ছিল এই কমিটির কাজ।

কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬-এ গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি হেষ্টিংস প্রবর্তিত পাঁচশালা পরিকল্পনা বাতিল করে দশ বছরের জমি বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত নেন। জমিদার ঘরে তার জন্ম। তাই জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়ার দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। জমিদাররাই ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি হবে একথা কর্ণওয়ালিস উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দশশালা পরিকল্পনাকে ১৭৯৩-তে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন।

বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করে কর্ণওয়ালিশ ভারতে ইংরেজ শাসনের পথকে প্রশস্ত করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হতে নিজামত আদালত কলকাতায় তুলে আনেন। ১৭৯০-তে বিচার কাজের দায়িত্ব তিনি নবাব নাজিমের হাতে তুলে দেন। প্রত্যেক জেলাকে তিনি থানায় ভাগ করে থানার ভার একজন দারোগার হাতে দেন। চৌকিদার নিয়োগ করা হলো গ্রামে গ্রামে। তিনি পুলিশ কমিশনার পদের সৃষ্টি করেন। কলকাতার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব একজন সুপারিন-টেনডেন্টের উপর দেওয়া হলো। বর্তমান ভারতের পুলিশী ব্যবস্থার পথ প্রদর্শক কর্ণওয়ালিশ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

কলকাতার গভর্ণর জেনারেল সারা ভারতের কোম্পানীর কাউন্সিল-গুলোর প্রধান। অন্যান্য গভর্ণররা গভর্ণর জেনারেলের পরামর্শ নিতে বাধ্য। স্বভাবতই সারা ভারতের ঘটনাগুলো কলকাতার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। হেষ্টিংসের (১৭৭৪-৮৫) আমলে ইংরেজদের সাথে মারাঠাদের দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলে। ১৭৭৫-এর সুরাটের সন্ধি ও পুরন্দরের সন্ধি মারাঠা শক্তিকে কিছুটা খর্ব করেছিল। ইংরেজ সেনাপতি গর্ডাড

১৭৮০-তে আমেদাবাদ দখল করেন। ইংরেজরা ১৭৮২-তে সলস্‌বাই সন্ধির মাধ্যমে সল্‌সেট লাভ করলো। হেষ্টিংসের মারাঠা নীতি সুফল হয়নি। বহু আর্থিক ক্ষতি ইংরেজদের স্বীকার করতে হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬—১৭৯৩) সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেননি। ১৭৭৯-এ তেওগাওঁয়ের যুদ্ধেও ইংরেজদের পরাজয় ঘটে। ওয়েলেসলির গভর্ণর জেনারেলরূপে কার্যকাল ১৭৯৮ হতে ১৮০৫। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের দিকে তিনি নজর দেন। এ সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকতেন। লর্ড ওয়েলেসলী এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি চালু করেন। এ প্রসঙ্গে বেশিনের সন্ধি (১৮০২), দেওগাঁওয়ের সন্ধি (১৮০৩), অঞ্জন গাঁওর সন্ধি (১৮০৩), ১৮০৪-এর একটি সন্ধি মারাঠা শক্তির উপর ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক।

১৭৬৭-তে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ও ১৭৮০-এ দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যুদ্ধে হায়দার আলী পরাজিত হন। নিজাম মাদ্রাজ সরকারের সাথে সন্ধি করেন। মাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৫) দ্বারা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ শক্তি বিপন্ন হয়। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯২) ইংরেজরা টিপুর প্রাধান্য খর্ব করে মহীশূরকে নামেমাত্র একটি রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হন। ইংরেজ শক্তি টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। ১৭৯৯-তে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হয়। ১৭৯৯-এর ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু নিহত হন। মহীশূর নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে ভাগ হলো।

গুর্খারা ব্রিটিশ সীমান্তের কিছু অংশ দখল করে নেবার ফলে ১৮১৫-তে লর্ড হেষ্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরেজরা সগৌলীর সন্ধির (১৮১৮) ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নেপালের পার্বত্য অঞ্চল, সিমলা-মুসৌরী ও আলমোড়া অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। উদয়পুর ও জয়পুরের সন্ধি দ্বারা রাজপুত রাজ্যগুলো ইংরেজ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। ফলে রাজপুতনায় ইংরেজ আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৩-এর মধ্যে আসমুদ্র হিমাচলে ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ বছর হতেই ভারত পরাধীন হলো।

পরবর্তী কালে লর্ড আমহার্স্টের (১৮১৩-২৮) আমলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ এবং ডালহৌসির আমলে (১৮৪৮-৫৬) দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ, লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে (১৮৩৬-৪২) সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ এবং লর্ড হার্ডিং-এর আমলে (১৮৪৪-৪৮) মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধের (১৮৪৬) পর ব্রহ্মদেশ, ও সিন্ধু প্রদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া লর্ড মিণ্টোর (১৮০৭—১৮২৩) আমলে অমৃতসরের সন্ধি শিখজাতির উপর ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার করে। ইংরেজরা ১৮৪৫-এর ১৩ই ডিসেম্বর শিখদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং শিখ বাহিনীকে পরাজিত করে এবং লাহোর চুক্তির (১৮৪৮) মাধ্যমে পাঁচলক্ষ টাকার বিনিময়ে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল ও জলন্ধর লাভ করে। ১৭৪৮-এ পাঞ্জাবীরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাবকে ইংরেজদের দখলে আনেন। ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্যটি ইংরেজদের করায়ত্ত হয়। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অভিযোগ তুলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

ভারতে ইংরেজদের রাজ্য বিস্তার প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও নীতি বিরুদ্ধ কাজকর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কলকাতায় অবস্থানকারী গভর্ণর জেনারেলরা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতির পরিচালকরূপে কলকাতা শহর হতেই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কলকাতার গুরুত্ব এভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি করতে থাকে। কলকাতা হলো লুঠের কেন্দ্রস্থল। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করে। ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের হাতেখড়ি হয়। তিনটি জেলা পাবার ফলে রাজস্বের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্দেশীয় লবণ ব্যবসায়ে দুরকম প্রথা ছিল। মুসলমান ব্যবসায়ীরা ২$\frac{1}{2}$% এবং হিন্দু ব্যবসায়ীরা ৫% শুল্ক দিতেন। কিন্তু কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর

ব্যবসায়ের উপর ইংরেজদের শুল্ক না থাকার ফলে ভারতের উৎপন্ন পণ্যের স্থান দখল করলো ইংলণ্ডের উৎপন্ন পণ্য। দেশীয় শিল্প মার খেলো। দেশীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থা হলো শোচনীয়। লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৬-৬৮)-তে সোসাইটি অফ ট্রেড নামক সংস্থা তৈরী করে লবণ ব্যবসায়ে অর্জিত লভ্যাংশ কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৬৮-তে লবণের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

এদিকে যে জমিদাররা বেশী রাজস্ব দিতেন তারাই জমিদারী পেতেন। রেজা খাঁকে দিয়ে ইংরেজরা লুঠের কাজটা ভালভাবেই চালায়। চৌধুরী গোমস্তাদের অবাধ লুণ্ঠনতো ছিলই। কোম্পানীর রাজস্ব খাতেও আয় বৃদ্ধি হয়। কর্মচারীরা ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করে। ১৭৬৯-৭০ হতে ১৭৭০-৭১ এ রাজস্ব ১০% বৃদ্ধি পেল। পরের বছর ১৭৭১-৭২-এ এই পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। কোম্পানীর অমানবিক নীতি কলকাতা তথা বাংলার জনগণকে শেষ করে দিল। বাংলার জন সংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ ও কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মারা গেলেও কোম্পানী রাজস্ব মকুব করেনি।

কলকাতা বন্দর হতে কয়েকটি বছরের কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্য কোম্পানীর ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধিকে প্রমাণ করে। ১৮০১-এ কলকাতার কোম্পানী নতুন শুল্ক নীতি গ্রহণ করে। অতীতে কলকাতায় কলকাতা শুল্ক ও সরকারী শুল্ক নামে দু'প্রকার শুল্ক ছিল। ১৭৯৫-তে কলকাতা শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮০১-এ তা আবার চালু হয়। এছাড়া কলকাতার টালি নালার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক বসানো হয়। এ ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর শুল্ক বাবদ আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। ১৮১০-এ কোম্পানী আবার শুল্ক নীতির পরিবর্তন করে। কলকাতা বন্দর মাধ্যমে ১৮১১-এর জুন মাস হতে ১৮১২-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৯৫ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হয়েছিল। এর ওজন ছিল $1\frac{1}{2}$ লক্ষ টন। এই তথ্যই কলকাতা বন্দর মারফৎ কোম্পানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণ।

অন্যদিকে কলকাতার ধনী সম্প্রদায় ব্যবসা, দালালি, বেনিয়ানি ও মুৎসুদ্দিগিরির মাধ্যমে আরও ধনী হতে থাকেন। কলকাতায় তৈরী হলো নতুন বণিক সমাজ ও দেশী বিদেশী শিল্পপতি!

কোম্পানীর বাণিজ্যিক উন্নতির সাথে মুদ্রা তৈরী ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের ঘটনাও উল্লেখ করার মতো। ১৭৬২-তে কলকাতায় প্রথম মুদ্রা তৈরী হলো। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পয়সা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গালে এক বস্তা কড়ি পাওয়া যেত। ১৭৭০ পর্যন্ত তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সবই ছিল রূপোর মুদ্রা। ১৭৯১ হতে ১৮৩২ পর্যন্ত কলকাতায় কোম্পানী নিজস্ব মুদ্রা তৈরী করাতো। ষ্ট্রাণ্ড রোডের টাঁকশাল ১৮৩২-তে তৈরী হয়। স্মিথ সাহেব বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড বেতনে ১৭৮০-তে ইংল্যাণ্ড হতে আমেষ্টার নামক এক মুদ্রা-বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসেন। প্রিন্সেস সাহেব কোম্পানীর কাছ হতে মুদ্রা তৈরীর চুক্তি গ্রহণ করতেন। তিনি ফলতার কারখানায় মুদ্রা তৈরী করতেন। মীরজাফর ১৭৬০-এ কোম্পানীকে টাকা তৈরীর অধিকার দেন। কোম্পানী ১৭৬২ হতে তা কার্যে পরিণত করে। কলকাতার কোম্পানীর এই অধিকার কলকাতা, বাংলা ও ভারতের অর্থনীতিকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেললো।

জেবার রাইডার ও এডওয়ার্ড হার কলকাতায় ১৭৮৫-এ প্রথম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্ক হতে পঞ্চাশ, একশ, পাঁচশ টাকার নোট ও সোনার মোহরের প্রচলন হয়। কলকাতার বিখ্যাত ধনী সুখময় রায় ঐ ব্যাঙ্কের একমাত্র বাঙ্গালী ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮০৬-এ কলকাতায় ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা নামে একটি ব্যাঙ্ক আবার স্থাপিত হয়। এর নাম করণ ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল হয়। বাঙালীর উদ্যোগে প্রথম স্থাপিত ব্যাঙ্ক হল সূর্যকুমার ঠাকুরের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (১৮১৯) জোসেফ ব্যারোটা সহযোগিদের অন্যতম ছিলেন। এই ব্যাঙ্ক ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে ছিল। মোট ৮ জন ডিরেক্টরের মধ্যে রঘুনাথ গোস্বামী ছিলেন বাঙ্গালী ডিরেক্টর। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ব্যাঙ্ক ১৮২৯। হতে ১৮৪৭ পর্যন্ত চালু ছিল। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ১৯২১-এর পর উঠে যায়।

অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোকে ১৯২১-এ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নাম দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ্কেই পরবর্তী-কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হয়।

কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধির পরেই লোক দেখানো উন্নয়নের প্রশ্ন এসে যায়। শোষণকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ঘটলো, অপরদিকে ইউরোপীয় সমাজের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখে উন্নয়নের কাজ চলতে থাকে।

কলকাতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৭৬৫-তে লালদীঘি সংস্কার, ১৮১৯-এ জল সরবরাহের ব্যবস্থা, ১৮৪৬-এ কলকাতা হতে ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ তৈরীর কাজ আরম্ভ, ১৮৫৫-তে ডালহৌসীর আমলে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু, ১৮৩৬-এ তেলের আলো, ১৮৫৬-তে গ্যাস বাতির ব্যবস্থা এবং ১৮৭৯তে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন চোখে পড়ে না।

১৭৬৮-তে কলকাতায় একটি মাত্র হাসপাতাল ছিল। দু'জন চিকিৎসকের মধ্যে হলওয়েল জমিদার ও অল্ডারম্যানের কাজ করতেন। ফুলারটনই ছিলেন ইউরোপীয়দের আশা ও ভরসার প্রতীক। দেশীয়রা কবিরাজের কাছে চিকিৎসা করাতেন। এছাড়া জলপড়া, ঝাড়াই-পোছাই, মাদুলী নেওয়া প্রভৃতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন। ১৭৬২-তে কলকাতার ৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫০ হাজার দেশীয় ও ১ হাজার ইউরোপীয় মানুষ মহামারীতে প্রাণ হারান। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পেও ম্যালরিয়ায় দীর্ঘদিন ভোগেন।

পৌর কর্তৃপক্ষ কলকাতার উন্নয়ন না করলেও কলকাতার উন্নতি হয়েছে। দেশী ও বিদেশীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, জাহাজঘাট, ঘড়বাড়ী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ১৭৯৬-তে রসারোড তৈরী হয়। বর্তমানে এর নাম আশুতোষ মুখার্জী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড। ১৮২০ পর্যন্ত কলকাতায় পাকা রাস্তার সংখ্যা ছিল ৫টি। এই একটি তথ্যই প্রমাণ করে কলকাতার পৌর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। আসলে শোষণ যাদের লক্ষ্য তারা উন্নয়নের কথা ভাববে কি করে?

পুরোনো কলকাতার কয়েকটি চিত্র
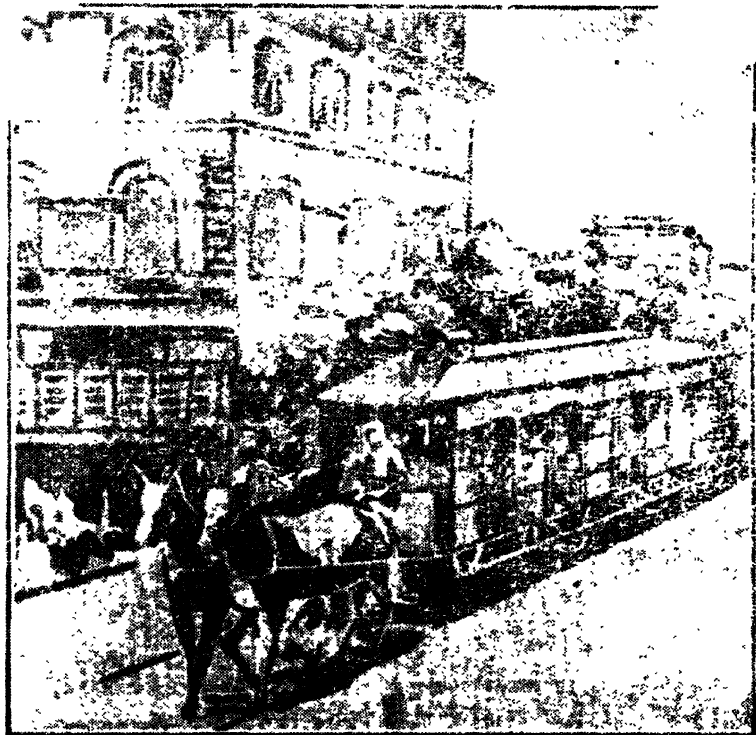
ঘোড়ায় টানা ট্রাম
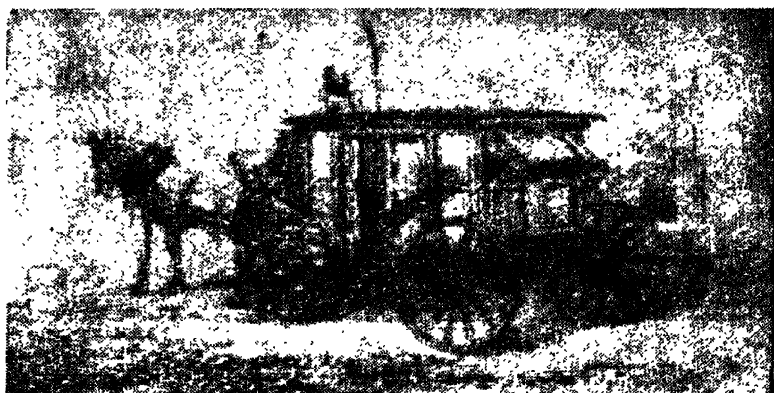
ঘোড়ার গাড়ী
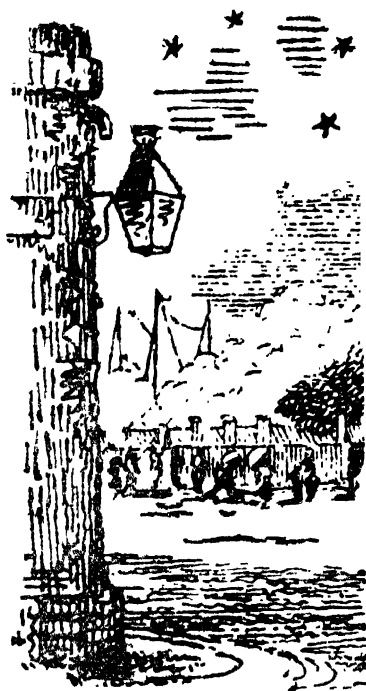
পাশের চিত্রটি পুরোনো কলকাতার রাতের রাস্তার দৃশ্য। আজ যেমন সন্ধ্যে হলেই রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আকারের আলোগুলো জ্বলে ওঠে, তখনকার দিনে একমাত্র গ্যাসপোষ্টের আলোই সম্বল ছিল। কর্মীরা সন্ধ্যের একটু আগে গ্যাসবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।
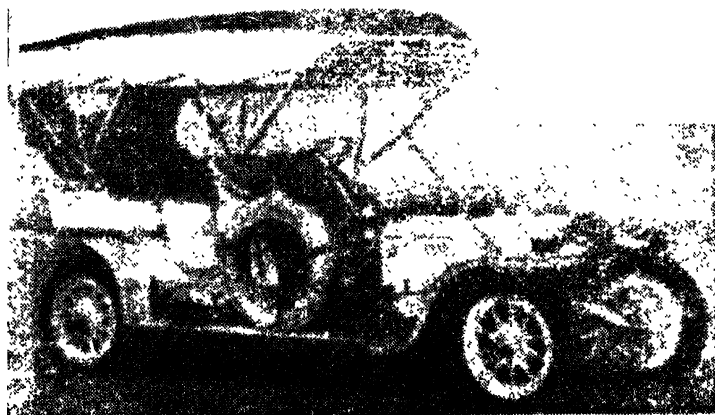
ছ্যাকড়া গাড়ি

প্রশাসনকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন ছিল অব্যাহত। লালদীঘির ১৭৮০-এ তিনতলা একটি বাড়ী তৈরী হয়। ১৭৮৪-তে এই বাড়ী উচ্চচূড়া বিশিষ্ট ভবনে পরিণত হয়। রাইটারদের নামানুসারে এর নাম হলো রাইটার্স বিল্ডিং। বর্তমান হাইকোর্টের পূর্বদিকে ১৭৯১-তে তৈরী হলো রাজভবন। ১৭৮৪-তে কলকাতায় বনমালী সরকার বাগবাজারে, উমিচাঁদ লালদীঘির উত্তরে, বৈষ্ণব দাস ও হুজরীমল বড়বাজারে নিজস্ব বড় বাড়ীতে বাস করতেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ব্লেক, ম্যাকফারসন ও লঙগ্যুভিলি সাহেবের বাড়ী তিনটি কলকাতার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ১৭৮০-তে গার্ডেনরীচ এলাকায় অসংখ্য বাড়ী ছিল। খিদিরপুরে রিচার্ড বারওয়েলের গৃহ অরফ্যান সোসাইটি ১৭৯৮-তে ভাড়া দেন। এটি একটি বড় বাড়ী ছিল। বর্তমান মিডলটন রোডে অবস্থিত 'লরেটো হাউসে' ইলিজা ইম্পে বাস করতেন। নিউ কোর্ট হাউস ছিল এসপ্লানেডে। স্যার উইলিয়াম জোন্স ঐ গৃহে বাস করতেন। এভাবে দেশীয় ও ইউ-রোপীয়দের বাড়ীগুলো কলকাতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

ধর্মের প্রতি মোহ ও আসক্তি অধিকাংশ মানুষের দীর্ঘদিনের সংস্কার। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নির্মীত পর্তুগীজ গির্জা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উন্নত করা হলো। রাসেল সাহেবের বাড়ীর একটা অংশে ১৭৭০-এ একটি চার্চ তৈরী হয়। বর্তমান মিশন রো (রাজেন্দ্রলাল মুখার্জী রোড)-তে এখনও এই চার্চ রয়েছে। বেথ টেলিকা প্রথমে একটি উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। ১৭৫৮-তে জ্যাকেরিয়া কারনেণ্ডার নামক একজন পাদ্রী কলকাতায় আসেন। তিনি একটি গীর্জা স্থাপনে সচেষ্ট হন। বেথ টেলিকার উপাসনা গৃহই ১৭৭০-এ ওল্ড মিশন চার্চ নামে পরিচিত হয়। চাঁদা সংগ্রহের অর্থ, স্ত্রীর গহণা বিক্রয়ের টাকা এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করার যৌতুক খরচ করে তিনি গীর্জাটি তৈরী করেন। ধর্মের প্রতি কারনেণ্ডারের আনুগত্যের কথা গীর্জাটিকে দেখলে আজও মনে না জেগে পারে না। ১৭৩১-এ চ্যারিটি স্কুল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাছে একটি গৃহে উঠে যায়। ঐ সময় ঐ গৃহেই

টাউন হল ছিল। ১৭৯২-তে ঐ গৃহ ভেঙ্গে গেলে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়। এই বছরেই ঐ ফাঁকা স্থানে সেন্ট জন গীর্জা স্থাপিত হয়। নবকৃষ্ণ চৌধুরী গীর্জা তৈরীর সময় জায়গাটি দান করেছিলেন।

কলকাতায় ভারতীয় এলাকায় গোবিন্দরাম মিত্র ন'টি মন্দির তৈরী করেন। এগুলো খুব উচ্চ ছিল। ইংরেজরা এগুলোকে গোবিন্দরামের প্যাগোডা বলতো।

প্রাচীন কালীঘাটের মন্দির তৈরী করে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়। বর্তমান প্রেসিডেন্সী জেলের কাছে এই মন্দির অবস্থিত ছিল। বর্তমান কালীঘাটের মন্দির তৈরীর কাজ ১৭৯৩-তে শুরু হয় এবং ১৮০৯-তে শেষ হয়। বরিষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় এই মন্দির তৈরী করেন।

কলকাতা শহরে নিয়মিত ভাবে গীর্জায় ঘণ্টা বাজার অনেক পরে কালীমন্দিরে কাঁসর ও ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। এটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা। কলকাতার স্বনামধন্য ব্যক্তিরা কলকাতায় বহু মন্দির তৈরী করেছিলেন। তন্মধ্যে ১৮২৫শে স্থাপিত রামগোপাল মল্লিক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও মন্দির স্থাপন উল্লেখযোগ্য। মুসলীম সম্প্রদায় কর্তৃক স্থায়ী মসজিদ কলকাতায় অনেক পরে তৈরী হয়। ১৭৯৪-তে ধর্মতলায় একটি পুরাতন মসজিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। কলকাতা গড়ে ওঠার সাথে সাথে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানও সমানতালে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে।

কলকাতায় দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ জীবনের চিত্র এই শতাব্দীতে উল্লেখ করার মতো। ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা ছিল নবাবের মতো। কোম্পানীর এক একজন কর্মচারী নিজেদের নবাব মনে করতেন। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নবাবের মতো জীবিকা নির্বাহ করলেও সাধারণ কর্মচারীদের জীবনে সুখ-সুবিধা ছিল না। অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পর থিয়েটার, নাচঘর, বলরুম ও টাভার্ণ তৈরী হবার ফলে কলকাতা নতুন রূপ পেল। ১৭৮৫-তে কলকাতায় ১১টি টাভার্ণ

ছিল। হেষ্টিংসকে একটি টাভার্ণে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল তাঁর কার্যকাল শেষ হবার পরে। বলরুম কথার অর্থ নাচঘর। হেষ্টিংসের দ্বিতীয় পত্নী লেডী ইম লালদীঘির থিয়েটারের বলরুমে নাচতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইউরোপীয় সমাজে মদের প্রচলন ছিল বেশী। তবে এদেশীয়দের কাছ হতে তামাক খাওয়াও ইউরোপীয়রা অভ্যাস করেন। ১৭৭৯তে কলকাতায় হুঁকো বরদারদের প্রধান্য ছিল। একবার গভর্ণর হেষ্টিংস বাড়ীতে ভোজসভার আয়োজন করেন। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের চাকর সঙ্গে আনতে নিষেধ করেন কিন্তু হুঁকো-বরদারদের সঙ্গে আনতে কোন আপত্তি জানাননি।

কলকাতায় ইংরেজ গভর্ণর, কাউন্সিল সদস্য ও কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের জীবন কাহিনী ছিল সে সময় কদর্যতায় ভরা। এ সময়কার কলকাতার ইংরেজদের নারী লোলুপতার কাহিনী কলকাতার ইতিহাসকে কলুষিত করে। নবাবরা সিংহাসনচ্যুত হলে তাদের বেগম ও দাসীদের ইংরেজরা কলকাতায় নিয়ে এসে প্রমোদভবনে তুলে বেলেল্লাপনা চালাতেন। মীরজাফরের প্রণয়িনী মণিবেগম হেষ্টিংসেরও প্রণয়িনী ছিলেন। নারীঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ফ্রান্সিস ও হেষ্টিংসের মধ্যে বর্তমান চিড়িয়াখানার কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। বর্তমান বেল ভেডিয়ার রাজপ্রাসাদের কাছে মিঃ লিঃ গ্রাণ্ড বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর প্রতি জঘন্য আচরণ করার জন্য গ্রাণ্ড ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। ফ্রান্সিস দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাননি। গ্রাণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবী করলে ফ্রান্সিসকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। এসব কাহিনী ইংরেজরা কি ধরণের সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ ছিল সেটাই প্রমাণ করে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামতনু লাহিড়ী (১৮১১—১৮৯৮) যখন চেতলায় থাকতেন তখন চেতলায় কালীঘাট তীর্থের কোনরূপ প্রভাব ছিল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা জঘন্য ছিল। নারীরা বারাঙ্গনা বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করতেন।

১৮৫২-তে হীরা বুলবুল নামক কলকাতার একজন বারাঙ্গনা হিন্দু

কলেজে তার পুত্রকে ভর্তি করাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এরূপ তথ্যও কলকাতার বারাঙ্গনাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এক শ্রেণীর মানুষের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন হতো। ফলে তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চারিত্রিক অধঃপতনও ঘটতো। এ সময়ে কলকাতার বাবু সম্প্রদায়ের বারাঙ্গনাদের গৃহে রাত কাটানো গর্বের বিষয় বলে গণ্য হতো।

ডিরোজিওর শিষ্যরা অনেকেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে দেশীয়দের মধ্যেও মদ্যপানের অভ্যাস গড়ে উঠে। দেশীয়রা মদ খাওয়া তো দূরের কথা মদ বিক্রয় করতেও রাজী ছিলেন না। কিন্তু ১৭৬৮-তে অনন্তরাম কুণ্ডু নামক একজন বাঙ্গালী প্রথম মদের দোকানের লাইসেন্স পান। তিনি সাহেব মহলে ও ভারতীয়দের মধ্যে মদ বিক্রয় করে সুনাম অর্জন করেন।

আমাদের দেশে অতীতে সংবাদপত্র ছিল না। সংবাদপত্রের প্রচলন ইংরেজ শাসনের একটি বড় অবদান। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হবার সাথে সাথে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও ১৭৮৬তে জেমস্ অগাষ্টাস হিকি নামক জনৈক ইংরেজ হিকারী গেজেট নামক সংবাদপত্র কলকাতায় প্রথম প্রকাশ করেন। ১৭৬৮তে উইলিয়াম বোলস্ প্রথমে সংবাদপত্র বের করার চেষ্টা করেন। কোম্পানীর বড় কর্তাদের দুর্নীতি সম্পর্কীয় তথ্য তার হাতে ছিল বলেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক তাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। হিকি স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি তার সংবাদপত্রে ইংরেজদের বিপক্ষে লিখতেও দ্বিধা করতেন না। হেষ্টিংসের উদ্যোগে ১৭৮৪তে সরকারী কাগজ 'দি ক্যালকাটা গেজেট' বের হয়। ইংরেজদের মালিকানায় বেঙ্গল হরকরা, মর্ণিং পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, ক্যালকাটা কুরিয়ার, ওরিয়েণ্টাল ষ্টার, ইণ্ডিয়া গেজেট ও এশিয়াটিক মিরর নামক সংবাদপত্র বের হতো। ওয়েলেসলী প্রবর্তিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে হতো প্রত্যেক পত্রিকাকে। প্রত্যেকের মনে এজন্য বিক্ষোভ থাকলেও বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক ম্যাকমিলান এই বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহসী

হন। তাঁকে ওয়েলেসলীর নির্দেশে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমন সময় শ্রীরামপুরে মিশনারীরা ছাপাখানা বসালে সংবাদপত্র জগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

১৮১৮তে শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত মারস্ম্যান সম্পাদিত সমাচার দর্পণ প্রথম বাংলা পত্রিকা। এখান হতে দিগ্‌দর্শন ও ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। ১৮৩১-এ বাংলাভাষায় প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এটি একবার বন্ধ হবার পর আবার ১৮৩৯-এ চালু হয়। এছাড়া ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কোমুদী' (১৮২১), ফারসী ভাষায় রামমোহনের 'মিরাত উল আকতার' (১৮২২), জেমস্ সিলফ্ বাকিংহামের 'দি ক্যালকাটা জার্নাল' (১৮১৮), অক্ষয় দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪৪), শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃত বাজার' (১৮৩৮) এবং হরিশচন্দ্র মুখার্জীর হিন্দু প্যাট্রিয়ট (১৮৫৫) এ শতকের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

এছাড়া ডিরোজিওর শিষ্যদের 'এথেনিয়াম', জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের 'সংবাদ রত্নাবলী', পাষণ্ডপীড়ন (১৮৪৬), গৌরীশংকর তর্কবাগীশের 'রসরাজ', নবকৃষ্ণ রায়ের সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭) ইত্যাদি স্বল্প বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

১৮২৩-এ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করলে রামমোহন রায় সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেন এবং ইংলণ্ডের রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠান। মেকলে ১৮৩৫-এ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইংরেজ শক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে পারে নি। ১৮৫৭-এর পরে সংবাদপত্রগুলো আরও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে।

এদেশের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এ সময়ের মধ্যে শুরু হয়। ১৮১৩-এর চার্টারে প্রতি বছর ভারতীয়দের জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত হয়। জনশিক্ষা কমিটি বা কমিটি অফ পাবলিক

ইন্সট্রাকসন নামক কমিটি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮২৩-এ তৈরী হয়। রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজের জন্য এই টাকা বরাদ্দ হলে তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ টেকেনি। ইউরোপীয় শিক্ষায় ভারতীয়দের শিক্ষিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-২৮) কলকাতার সংস্কারপন্থীদের সমীহ করে চলতেন। এদিকে রামমোহন রায়ের চাপও ছিল। আমহার্ষ্ট তাই দুদিকই বজায় রাখলেন। ১৮২৭-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের গৃহের ভিত্তিস্থাপন হলো।

বেন্টিকের আমলেই ইউরোপীয় শিক্ষার সরকারী নীতি গৃহীত হয়। মেকলে ১৮৩৫-এ শিক্ষা সম্পর্কে জোর সুপারিশ করেন। চাকুরী পাবার ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রাধান্য দেখে বিত্তবানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর বেসরকারী প্রচেষ্টায় কলকাতায় ইংরেজী স্কুল চালু হয়েছিল। মিঃ বুর চিয়ের নামক একজন ব্যবসায়ী ইউরোপীয় বালকদের শিক্ষার জন্য ডালহৌসীতে ১৭৬০-এ একটি দাতব্য স্কুল স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এটাই কলকাতার প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। এছাড়া ডিরোজিওর আমলে ধর্মতলার ডেবিড ড্রামন্তের স্কুল ব্যতীত দু-একটি ইংরেজী স্কুল ছিল। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের এদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা ছিল। এছাড়া উইলিয়াম কেরীর বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থ রচনা করে পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটান। কেরী রচিত বাংলা ব্যাকরণ, রামরাম বসু রচিত 'প্রতাপাদিত্যচরিত,' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' সে সময়কার উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ঈশ্বরচন্দ্র এই কলেজের অধ্যাপক হন।

১৮৪৭-এ এই কলেজে থাকাকালীন তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী গরাণহাটা নামক স্থানে হিন্দু কলেজ খোলা হলো। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, প্রধান বিচারপতি হাইড, লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর আর্ভিন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই কলেজ পরে চীৎপুরে চলে যায়। কুড়িজন ছাত্র নিয়ে কলেজ আরম্ভ হলেও ডিরোজিওর আমলে ছাত্রসংখ্যা ৪০২ জন হয়। ১৮৫৫তে এই কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়।

স্কটিশ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ ১৮৩০-এ জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন কলকাতায় স্থাপন করেন। এটাই পরবর্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত হয়।

১৮১৯-এ ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির একজন সভ্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এ সময় ফিমেল জুভেনিল সোসাইটি নামক একটি সভা স্থাপিত হয়। ১৮২৮-এ ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির (ইংলণ্ড) কুমারী কুক এদেশে আসেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। অল্প দিনের মধ্যে কলকাতায় ১০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ২২৭ জন বালিকা শিক্ষালাভ করতে থাকেন। উইলসন নামক একজন মিশনারীর সঙ্গে কুকের বিবাহ হলে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধা দূর করবার উদ্দেশ্যে লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নীর প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বেঙ্গল লেডিস সোসাইটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৪-এ সারা বাংলায় ১৯টি বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট হতে পাওয়া যায়। তবে বেথুনের প্রচেষ্টায় ১৮৪৯-এ স্থাপিত বেথুন স্কুল সবচেয়ে অধিক উল্লেখযোগ্য। এর পরে স্কুলটি বেথুন কলেজ নামে পরিচিত হয়।

১৮৩০ হতে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়টা শিক্ষাক্ষেত্রে ডাফের যুগ বলে

পরিচিত। ডাফ সাহেবের আমলেই ১৮৩৫-এ অ্যাডাম সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশ গৃহীত হয় এবং ১৮৪২-এ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠিত হয়। কোম্পানির বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের উচ্চশিক্ষা সুপারিশ উড ডেচপ্যাচের (১৮৫৪) সুপারিশ অনুসারেই ১৮৫৭তে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা শুরু করে।

কলকাতায় ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হলেও মুসলিম সম্প্রদায় ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ১৭৮২তে স্থাপিত কলকাতা মাদ্রাসাই ছিল তাদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ইংরেজী শিক্ষার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝাতে সক্ষম হন। ফলে তাদের মতের পরিবর্তন হয়। অবশ্য তাঁর প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

কলকাতায় শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিওর নাম সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। ইনি (১৭৭৫-১৮৪২) ঘড়ির ব্যবসায়ীরূপে কলকাতায় এসে কলকাতার শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৮১৭তে কিছু কলেজ স্থাপনের পর স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি সভা তিনি স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে এই সংস্থার যোগাযোগ ছিল। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহ করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ১৮১৮তে পটল-ডাঙ্গায় একটি স্কুল তৈরী করেন। বর্তমানে ঐ স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল। এ বছর ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল সোসাইটি নামে তিনি আর একটি সভা স্থাপন করেন। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব তার সম্পাদক হন। এই সংস্থা ঠনঠনিয়া, কালীতলা, ও অন্যান্য স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে। এ ছাড়া ১৮৩৯-এর ১৪ই জুলাই বাংলা পাঠশালার ভিত্তি স্থাপন করেন হেয়ার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অ্যাডাম সাহেব ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩—৬৮) প্রধান ছিলেন। ১৮৩৫-এ কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলো। ডেভিড হেয়ার ১৮৩৭-এ কলেজের

সম্পাদক হন। হেয়ার শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু সে সময় শিক্ষাসম্পর্কীয় কোন কিছু হেয়ারকে বাদ দিয়ে ভাবা যেত না।

হেয়ারের প্রতি কলকাতার মানুষের ভালবাসা ও মমতা ছিল অসাধারণ। ১৮৪২-এর ১লা জুন কলেরায় তিনি আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার মানুষের দুঃসহ ব্যথা ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো মিছিলের মাধ্যমে। ঐ মিছিল ছিল সেযুগের সর্ববৃহৎ মিছিল।

হেনরী ভিভিয়া ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ১৮২৮-এ হিন্দু কলেজের সাহিত্য ও ইতিহাসের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেও অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত ছাত্রবৃন্দ তাঁর সংস্পর্শে এসে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক সেসন ছিল বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্রস্থল। তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার হিন্দুধর্মকে আক্রমণ প্রধান কাজ ছিল। তাঁর শিষ্যরা অনেকেই শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সুশিক্ষক হওয়া সত্বেও হিন্দু কলেজ কমিটি তাঁকে পদচ্যুত করেন। ১৮৩১-এ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ডিরোজিও মারা যান। তাঁর এই অকাল মৃত্যু কলকাতার সনাতনপন্থী হিন্দুদের কাছে বিরাট আশীর্বাদ।

শিক্ষার প্রসারের সাথে সাহিত্য, নাটক, চারুকলা, খেলাধূলা ইত্যাদির প্রসারের মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতির জন্ম কলকাতাকে উন্নত করে তোলে। পৌরস্বাস্থ্য সম্পর্কে কলকাতা পিছিয়ে থাকলেও বিদেশী ও দেশী জ্ঞানীজনের কর্মপ্রেরণা ও উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জার্মান চিত্রকর বোহান জেকানি কলকাতায় এসে বহু ছবি এঁকেছেন। টমাস ডানিয়েল নামক আর একজন পর্যটক কলকাতায় থেকে বিভিন্ন ছবি আঁকেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন চিত্রকর। এসব চিত্র অতীতের কলকাতাকে জানার ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ এনে দেয়।

ডালহৌসী স্কোয়ারের থিয়েটারটি সিরাজের আক্রমণের সময় নষ্ট হয়ে যায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পিছনে আর একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ছন্দোময় রূপ নাটক ও উপন্যাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। গীতিকাব্য ছিল ঐ সময়ের স্বাধীনতা, জাতীয়তা-বাদ, মানবতাবাদ ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। প্রাচীন ভারতে নাটকের প্রচলন ছিল। ১৭৯৫তে গোরোসিম লেবেদেও নামক একজন রুশ পর্যটক বর্তমান চীনাবাজারের কাছে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপন করে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও দুটি ইংরেজী নাটক অভিনয় করান। তিনি নিজেই নাটকগুলোর অনুবাদ করেন। কলকাতার নাট্যজগতে এই বিদেশী ব্যক্তির অবদান উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চৌরঙ্গী ছিল বিরল জনবসতি এলাকা। ১৮১৩ হতে ১৮৩৯-এর মধ্যে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মিলনস্থলে চৌরঙ্গী নামে একটি থিয়েটার ছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। ঐ থিয়েটারের অভিনেত্রী মিসেস লী স্বদেশে চলে যান। ১৮৪০এ ইংলিশ ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকেলার পুনরায় বর্তমান জগদীশ বসু রোড ও পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে সিমেট্রির কাছে'সাঁ-সুশী' নামে আর একটি থিয়েটার খোলেন। ঐ মঞ্চে ১৮৪০-এ স্যার উইলিয়াম কোরের 'দি ওয়াইফ' অভিনীত হয়। স্বদেশ থেকে লীচ ফিরে এসে আবার অভিনয় করেন।

১৮৪১এর ১৮ই নভেম্বর অভিনয়ের সময় লীচের কাপড়ে আগুন লাগে। অভিনয় দক্ষ লীচের কাপড়ে আগুন লাগলেও দর্শকরা তাকে অভিনয়ের অংশ বিশেষ মনে করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেনি। দুদিন পরে লীচ মারা যান। তারপর হতে থিয়েটারটি উঠে যায়। কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাসে মিসেস লীচই হলেন প্রথম শহীদ।

উইলিয়াম কেরী ১৮০৪এ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তৈরী করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্স ১৭৯২তে কলকাতায় টাউন হল স্থাপনের জন্য এক সভা করেন। দীর্ঘ বার বছর ধরে ১৮০৪এ ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় তৈরী হলো টাউন হল। কলকাতায় চৌরঙ্গীতে ১৮১৪তে তৈরী হলো যাদুঘর বা মিউজিয়াম।

১৮৩৫এ কলকাতায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লাইব্রেরী ১৮৪৪এ লর্ড মেটকাফের স্মরণার্থে মেটকাফ হল তৈরী হলে সেখানে উঠে যায়। পরবর্তীকালে এই লাইব্রেরী ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এটা আলিপুরে অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক স্থাপিত 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮০৬তে এই সংস্থার নতুন গৃহ তৈরী হয়। পরে ১৮৩৯এ গৃহের পরিবর্ধন ঘটে। ১৮৬৬তে ইহা ভারত সরকারের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় শেক্সপিয়ার সরণীতে অবস্থিত এই ভবন কলকাতার প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় এখনও বহন করে চলছে।

স্থাপত্য শিল্পে কলকাতা পিছিয়ে ছিল না। শত শত প্রাচীন মন্দির, গীর্জা ও মসজিদের পাশাপাশি শহীদ মিনার স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের সেনাপতি অক্টারলোনীর স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮১৫তে স্থাপিত হলো অক্টারনোলী মনুমেণ্ট। পরবর্তীকালে এটি শহীদমিনার নামে পরিচিত হয়।

১৮৩৫এ এডেলিড উইলসন নামক এক ব্যক্তি ডালহৌসী স্কোয়ারে অকল্যাণ্ড হোটেল অ্যাণ্ড হল অফ অল নেশনস্ নামক হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ ১৪ বছর পরে এটা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই হোটেল কলকাতার একটি প্রধান আকর্ষণ।

লর্ড অকল্যাণ্ডের (১৮৩৬—৪২) দুই বোন এমিলি ইডেন ও জলি রাজভবনে থাকতেন। এমিলির গাছ-পালার দিকে ছিল অসাধারণ আকর্ষণ। রাজভবনের নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনি গাছপালা লাগাতেন। এমিলি ইডেনের বাগানই ১৮৪০এ ইডেন গার্ডেন নামে পরিচিত হয়। ক্রিকেট খেলায় বর্তমানে ইডেন উদ্যানের মাঠ ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ক্রিকেট অনুরাগীদের সংখ্যা কলকাতায় কম নয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটোনিয়ান সিভিল সারভ্যান্টস্ ও একটি ব্রিটিশ দলের মধ্যে কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতে অনুষ্ঠিত

প্রথম ক্রিকেট খেলা। স্মৃতিসৌধ স্থাপন, শিল্পকলা গৃহ স্থাপন, হোটেল ও নাট্যশালা স্থাপন, যাদুঘর স্থাপন, লাইব্রেরী স্থাপন, বাগান তৈরী ও খেলাধূলার আয়োজন কলকাতাকে গৌরবান্বিত করেছে। কলকাতার ইতিহাস এ সবকিছুই নতুন সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

দেশী ও বিদেশী জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সদিচ্ছা ও কর্মোদ্যাগ কলকাতাকে নতুন পথ দেখায়। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, গভর্ণরদের, বিচারপতিদের, পাদ্রীদের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। এদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ ছিল। কেউ মানুষ হিসাবে ভাল ছিলেন বলে ভাল কাজ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম অনুযায়ী স্বার্থ ছাড়া চলা বা কোন কাজ করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু কিছু কিছু কাজকর্ম হয়েছে। কলকাতার সান্ত্বনা সেখানেই। নিঃস্বার্থ মানুষরূপে ডেভিড হেয়ার ছিলেন সবার ঊর্ধে। ব্যক্তিগত লাভ ও লোকসানকে অধিক গুরুত্ব দিলেও দেশীয়দের অবদানও কলকাতাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কম নয়। এছাড়া

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো নিঃস্বার্থ মহাপুরুষতো আছেনই। দেশীয় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন, জনসেবামূলক কাজকর্ম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কলকাতার ইতিহাসকে অমর করেছে।

রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) ১৮১৪ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। ১৮১৫তে তিনি কলকাতায় আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মীয়সভায় রাজনীতি, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হতো। তিনি ১৮২৮এ চীৎপুরে কমল বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন। ইহা ১৮৩০-এ ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। হিন্দুধর্মের গোড়ামী ও কুসংস্কারে বীতশ্রদ্ধ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। অপরদিকে সনাতনপন্থী হিন্দুরা তখন সোরগোল তুলেছেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, হিন্দু বিধবাদের সম্পত্তির অধিকার ও পুনঃবিবাহ সম্পর্কে তাঁর মতামত ও আন্দোলনের জন্য সনাতনপন্থী হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ সতীদাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। ১৮১৮তে সনাতনপন্থী হিন্দুরা এ ব্যাপারে হেষ্টিংসের কাছে আবেদন করেন। লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে ১৮২৩এ কলকাতার কাছে একটি সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে এ সময় তীব্র আন্দোলন হয়। হেষ্টিংসের আমলে বাংলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ২৩৪ জন ব্রাহ্মণ, ৩৫ জন ক্ষত্রিয়, ১৪ জন বৈশ্য এবং ২৯২ জন শূদ্র মোট ৫৭৫ জন সহমৃতা হন। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে কলকাতাতে সহমৃতার সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধের দাবীতে জনমত গঠন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২৯-এ লর্ড বেন্টিক সতীদাহ নিরোধ আইন পাশ করেন। এর ফলে হিন্দুসমাজের সনাতনপন্থীরা বিরাট ধাক্কা খান। রামমোহন রায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হতে থাকে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় রামমোহনকে। ১৮১৫ হতে ১৮২০-এর মধ্যে তিনি বেদান্তসার এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (বাংলা ও ইংরেজী), সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক রচনা করেন।

তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী মিঃ উইলিয়াম অ্যাডাম খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ ত্যাগ করে একেশ্বরবাদের পূজারী হন। ফলে হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের তিনি শত্রু হন।

আসলে পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করাই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩৩-এ ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে তাঁর মৃত্যু হয়। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও ১৮৩৮তে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে উহার পুনরায় প্রাণসঞ্চার হয়। ১৮৩৯-তে তাঁর স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভা কলকাতাকে নতুন পথ দেখায়। এই সভা পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন যুগের সৃষ্টি করে।

সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ রূপে রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করতে হয়। ১৮২১-এ তিনি কলকাতায় আসেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের পর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক হন। পরে সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদক, লাইব্রেরীয়ান, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৮৫৮তে তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সমাজসংস্কারে মন দেন।

১৭৫৮ হতে ১৮৫৭-এর মধ্যে কলকাতায় যাদের জন্মমৃত্যু এবং কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে তাদের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৬৬তে এবং নবকৃষ্ণ চৌধুরী ১৭৯৭তে মারা যান। ইংরেজ সরকারের সাথে এই দুজনের ভূমিকা ন্যাক্কারজনক হলেও দানশীলতা, সমাজসেবা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এ দুজন সে সময় কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী (১৮২৯—১৮৭৬), কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক, বহু সরকারী পদের অধিকারী এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দিগম্বর মিত্র (১৮১৭—৭৯) কলকাতায় ঐ সময় স্বনামধন্য ব্যক্তি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে ইংরেজদের কাছে প্রিয় হন। দুর্গাচরণ সাহা সে সময় দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহলে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলে পরিচিত

ছিলেন। কলুটোলার মতিলাল শীল (১৭৯২—১৮৫৪) ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও দানশীলতার জন্য সুনাম অর্জন করেন। হরচন্দ্র ঘোষ সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদরূপে, দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৬—৭৪), প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৩) সাংবাদিকরূপে, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরূপে. কৃষ্টরাম বসু (১৭৩৩—১৮১১) কোম্পানীর কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবীরূপে, এবং সাংবাদিক ও কবিরূপে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১১—৬০) কলকাতায় স্বনামধন্য ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন।

পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানের মল্লিক পরিবারের গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক, বৈষ্ণবদাস (১৭৭৫—১৮৪১) ও রাজেন্দ্র মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম কলকাতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির জন্য গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক সে সময় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় অন্নছত্র খুলে কলকাতার দুর্গত মানুষদের মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেন। বৈষ্ণবদাস ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। দরিদ্রনারায়ণ ও ব্রাহ্মণদের সেবা করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বাড়ীর উৎসবাদিতে ইংরেজদেরও তিনি আপ্যায়ন করতেন। নীলমণি মল্লিকের পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক চোরবাগানে উঠে যান। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকরূপে, সমাজসেবী ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র যদুনাথ মল্লিক চিত্রাঙ্কন ও বাস্তবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কোম্পানীর বিভিন্ন পদ বিভিন্ন সময়ে তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। বড়বাজারের মল্লিক পরিবারের নয়নচাঁদ মল্লিক (১৭১০—৭৭), নয়নচাঁদ মল্লিকের পুত্র নিমাইচাঁদ (১৭৩৬—১৮০৭) ও নিমাইচাঁদের পুত্র রামগোপাল মল্লিক (১৭৬৯—১৮৩৩) ধনী ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে কলকাতার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

শ্যামবাজারের নন্দলাল বসু (—১৮৭৪) জমিদার ছিলেন। রাণী রাসমণি দানশীলতার জন্য ঐ সময়ের বিখ্যাত মহিলা। কোম্পানীর সাথে বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্ব তাঁর তেজস্বীতার পরিচয় বহন করে। ১৮৫৫তে

তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫—৬৮) ব্যবসায়ী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নিজেই একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল আর. জি. ঘোষ অ্যাণ্ড কোং। ইংরেজী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য সমিতিকে প্রচুর অর্থ তিনি দান করেন।

রামদুলাল দে সরকার (১৭৫২—১৮২৫) পিতা বলরাম সরকার কোম্পানীর একাধিক বেনিয়ানের কাজ করে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। অতিথিশালা, বাংলা ও বাংলার বাইরে একাধিক মন্দির স্থাপন করে তিনি বিখ্যাত হন। রামদুলালের দুই পুত্র আশুতোষ (ছাতুবাবু) ও প্রথমনাথ (লাটু বাবু) দুজনে দানশীলতার জন্য ঐ সময়ে কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। শারীরিক শক্তির জন্য লাটুবাবু ও সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্য ছাতুবাবুর নাম তখন কলকাতার মানুষের মুখে মুখে থাকতো। কলকাতার রামবাগানের গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কন্যা তরু দত্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন। ইনি সে সময় ইংরেজী কবিতা রচনা করে বিখ্যাত হন। জোড়াসাঁকোর নন্দরাম সিংহীর পুত্র কালীপ্রসন্ন সিংহী (১৮৪৮—৭০) বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন। বাংলা উপন্যাস 'হুতোম পাঁচা' তাঁরই লেখা। মহাভারত অনুবাদ করে তিনি বিখ্যাত হন।

শোভাবাজারের রাজ পরিবারের রাধাকান্ত দেব পিতা রামসুন্দর দেব, কমলকৃষ্ণ দেব (১৮২০) ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ঐ সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের মধ্যে শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারকরূপে রাধাকান্ত দেব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু গোঁড়া ও সনাতনপন্থী হিন্দুরূপে সতীদাহ প্রথা নিরোধের বিপক্ষে ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন (১৭৯৫—১৮৪৪) বৃটিশ বন্ধুরূপে উজ্জ্বল ভূমিকা দেখান ঠিকই। কিন্তু শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর ঐ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঠাকুর পরিবারের

গোপীমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩—৬৮) ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম (১৭৯৪—১৮৪৬) উল্লেখযোগ্য। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সুরুচির পথে দেশকে নিয়ে যাবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর-গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম। দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষানুরাগী ও সমাজসংস্কারকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ান পদে তিনি অধিষ্ঠিত থেকে ধনী হন। তিনি 'কার ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোং' এবং একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে বিখ্যাত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত যাত্রা করেন।

১৭৫৮ হতে ১৮৫৭-এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৩৮), উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪৪), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৪৪) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪৮), রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (জন্ম ১৮৩৬), যদুনাথ মুখার্জী (জন্ম ১৮৩৯), দ্বারকানাথ মিত্র (জন্ম ১৮৩৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (জন্ম ১৮২৪), প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (জন্ম ১৮১৪), মহেন্দ্রলাল সরকার (জন্ম ১৮৩৩), কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭), রাধানাথ শিকদার (জন্ম ১৮৩১), কালীচরণ ঘোষ (জন্ম

১৮৩৫), ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তি কলকাতা ও তার আশেপাশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের কর্মজীবন গড়ে উঠেছিল। এই সময় এঁদের অনেকেই শিশু ও যুবক।

কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪—৬১), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—১৮৫৮), শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০—৬৭), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০—৮৬) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬—৮৭), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—৭৩) প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে দুচার কথা বলা আবশ্যক। এঁদের কার্যকলাপ কলকাতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত সমাজ সংস্কারক-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। ১৮৪৩ হতে ১৮৫৫ পর্যন্ত দক্ষতার সাথে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে তিনি বিখ্যাত হন। তাঁর রচিত পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা-সম্ভব, 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নীলকর চাষীদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী হরিশ্চন্দ্র তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়টে প্রকাশ করে বিখ্যাত হন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদ করেন। রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব তা নাটকে অনুবাদ করে হিন্দু প্যাট্রিয়টে ছাপান। এজন্য লঙ্ সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহী জরিমানা টাকা প্রদান করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডিরোজীওর শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

এডুকেশন গেজেট নামক পত্রিকার সম্পাদকরূপে, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকরূপে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সে যুগে বিখ্যাত।

বিচারক রূপে শম্ভুনাথ পণ্ডিত বিখ্যাত ছিলেন। দানশীলতার জন্য তাঁর নাম কলকাতার মানুষেরা আজীবন স্মরণে রাখবেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশে'র অভ্যুদয় বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত

কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

কালীপ্রসন্ন সিংহী

বিনয়কৃষ্ণ দেব

নবকৃষ্ণ দেব

প্যারীচাঁদ মিত্র

রাধাকান্ত দেব

রামদুলাল দে (সরকার)
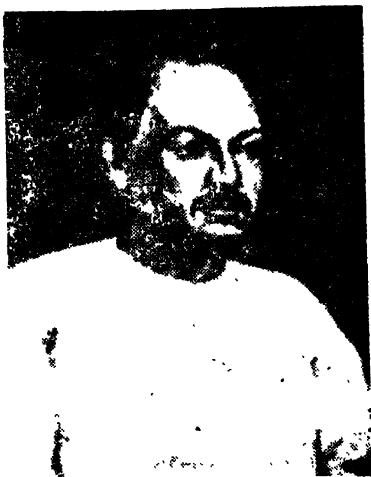
রাজেন্দ্র মল্লিক

প্রতাপচন্দ্র সিংহ

দ্বারকানাথ মিত্র

অক্ষয়কুমার দত্ত
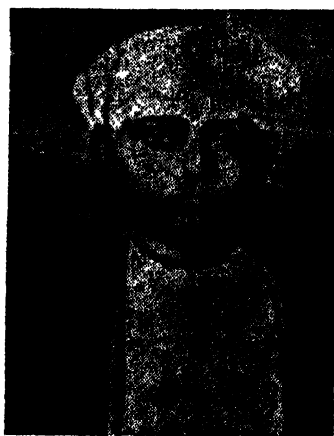
মতিলাল শীল

দ্বারকানাথ ঠাকুর

তরু দত্ত

দুর্গাচরণ লাহা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রমেশচন্দ্র দ·

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

যদুলাল মল্লিক
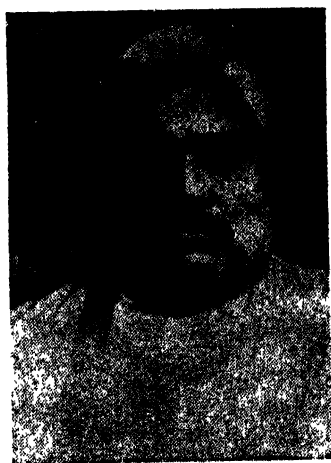
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কেশবচন্দ্র সেন

রমেশচন্দ্র মিত্র

উইলিয়ম জোনস্
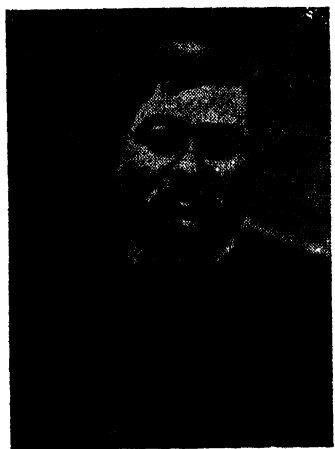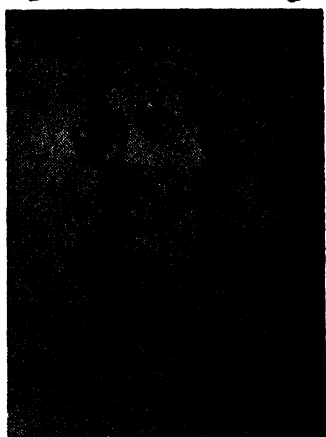
সৃষ্টি করেছিল। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি বিখ্যাত হন।

সাহিত্য সাধনা, সমাজ-সংস্কার, ব্যবসায়, শিক্ষার প্রসার, চিত্র ও চারুকলা, স্বাস্থ্য চর্চা ও বিভিন্ন প্রকার সমাজ সেবার সংগে যুক্ত একশত বছরের কলকাতার অসংখ্য বাণীগুলি ব্যক্তিদের মধ্যে উপরোক্ত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত আরও অনেকে রয়েছেন। কলকাতা গড়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

এ প্রসঙ্গে কলকাতাতে সুদীর্ঘ দিন ব্যাপী ইংরেজদের অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ, মানুষের জীবন-জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্যাতে অস্বীকার করা, বিচারের মাঝে বিভীষিকা সৃষ্টি করা উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশীয়দের অনেকে এই অত্যাচার ও অবিচারের অংশীদার হন। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে সব কিছুর বিরুদ্ধে আন্দোলন। দেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর মানুষেরাই এই আন্দোলনের অংশীদার। সে সময়কার মানুষের চেতনার ভিত্তিতে ঐ সমস্ত আন্দোলনকে বিচার করলে পরবর্তীকালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্দোলনের রূপরেখা বিশ্লেষণ করা সহজ হওয়া সম্ভব।

অগ্নিকাণ্ডের জন্য কলকাতা ১৭৮০তে ছিল বিখ্যাত। এ বছর বহু ঘরবাড়ী পুড়ে যায়। কমপক্ষে ২০ জন মানুষ মারা যান। এ সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের সাথে স্বার্থজনিত ঘটনা জড়িত ছিল। জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে গরীবমানুষের বাড়ী বিত্তবানরা পুড়িয়ে দিতেন। কিন্তু বিদেশী নাবিকেরা প্রায়ই আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করতেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে দেশী-বিদেশী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সে যুগেও কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশে বাস করতেন।

ক্রীতদাস প্রথা কোম্পানির আমলে পূর্ব হতেই চালু ছিল। বিদেশীরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও ইউরোপে কলকাতার ক্রীতদাসদের বিক্রয় করতো। এজন্য কলকাতায় বিক্ষোভ ছিল। শেষ পর্যন্ত লর্ড এলেন বরার আমলে ক্রীতদাস নিরোধ বিল পাশ হলে এই জঘন্য প্রথা কলকাতা হতে লুপ্ত হয়।

১৭৫৯-এ ইংরেজদের চাকররা বেতন বৃদ্ধির দাবা করেছিল। তখন তাদের প্রতি দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। জীবন-জীবিকার লড়াইকে চাকররা চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করার ফলে ১৭৮৭তে চাকরদের বেতন তিন গুণ হয়ে যায়। কলকাতার বেতন বৃদ্ধি আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলনই প্রথম বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন।

নীলচাষীদের উপর অত্যাচার ছিল সে যুগে ইংরেজ নীলকরদের মুনাফা লোটার জন্য শোষণের নতুন কৌশল। চাষীরা নীল চাষ না করলে ম্যাজিস্ট্রেট তাদের শাস্তি দিতেন। এ ব্যাপারে সারা দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কলকাতায় সেই ঢেউ এসে পৌঁছায়। জার্মানী কৃত্রিম নীল আবিষ্কার করলো। ১৮৩২-এ আসামে এ্যানড্রু চার্লটন চা গাছ আবিষ্কার করেন। নীল শিল্পের স্থান চা শিল্প দখল করে। চা বাগানের শ্রমিকদের উপর শোষণ আরম্ভ হলো। কিন্তু নীলচাষীদের পরবর্তীকালের আন্দোলন ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে থাকলো।

১৮২১ হতে ১৮৩১ পর্যন্ত তিতুমীরের নেতৃত্বে কলকাতার নিকটবর্তী বারাসতে ওহাবী আন্দোলন শুরু হলো। মেজর স্কটের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরা এ বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা হতে ঐ বিদ্রোহ দমন করতে যায়। তিতুমীর ও বহু লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারালেও এই আন্দোলন ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছিল।

দুর্নীতির জন্য মহারাজ নন্দকুমার গভর্ণর হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইম্পের সহায়তায় কাগজপত্র জাল করে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ সকাল ৯টায় বর্তমান সেন্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসী দেওয়া হয়। আইনের ব্যভিচারে নিরাপরাধ নন্দকুমারকে প্রাণ দিতে হলেও গভর্ণরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ দৃঢ় মানসিকতার পরিচয়।

১৭৭৮-১৭৮৭তে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতা মজনুশাহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা দেখান। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ভয়ে ১৭৭৩-এ কলকাতার ইংরেজরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কলকাতা হতে সন্ন্যাসী

ও ফকিরদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার জন্যই সন্ন্যাসী ও ফকিররা বিদ্রোহ করেছিল। ১৭৭৪-এ লর্ড অকল্যাণ্ড স্বীকার করতে বাধ্য হন যে এই বিদ্রোহে ইংরেজদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ১৭৫৭-এর মহা বিদ্রোহ কলকাতায় সংঘটিত না হলেও এই বিদ্রোহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে। কলকাতার ইংরেজরাও বেশ ভীত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ কলকাতার কোম্পানীর কাছে ছিল বিরাট একটি ধাক্কা। এ বছরে গভর্ণর জেনারেল পদে আসীন ছিলেন লর্ড কেনিং।

১৮৩৬-এ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও অনেকে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তৈরী করেন। ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইংরেজদের সমালোচনার উদ্দেশ্যে এটা তৈরী হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জমিদার সভা ১৮৩৮-এ তৈরী করেন। পরের বছর উইঃ অ্যাডাম ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি তৈরী করেন। ১৮৪৩-এ কলকাতায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হল। ইউরোপীয় অপরাধীদের দেশীয় আদালতে বিচার করার জন্য বেথুন এ সময়ে একটি প্রস্তাব আনেন। বৃটিশরা বেথুনের এই প্রস্তাবকে মেনে নেয়নি। তারা আন্দোলন শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫১-এ স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পাদক হন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এরূপ সংস্থা ঐ সময় গড়ে ওঠে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোই এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই সংস্থার সাথে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিশে গেল। এটা জমিদারদের সংগঠন ছিল। ঐ সময়কার কলকাতার শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ধনীব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা মিলে এক আবেদন পত্রের মাধ্যমে ভারতে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ গঠনের দাবী জানান। এর থেকে বেশী কিছু দাবী করার মত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী এই সংগঠনের ছিল না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ মত ও পথ এই দাবীর স্বরূপের মধ্যেই ঐ সময় প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস এ সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট করে তোলে।

চতুর্থ অধ্যায়

(১৮৫৮-১৯৪৬)

সিপাহী বিদ্রোহ কলকাতার মানুষের উপর ততটা ছাপ ফেলতে পারেনি। বিত্তবানরাই আতঙ্কগ্রস্ত হন বেশী। তাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ হয়ে যাবে এটাই ছিল ভয়। বিদ্রোহের সময় কলকাতাকে নিয়ে ইংরেজরা ভাবেনি। ভাবতে হলো বিদ্রোহের পরে। এই বিদ্রোহ সারা ভারতের মানুষকে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লববাদী করেছে। এদিকে কোম্পানির অবস্থাও শোচনীয়। তাই একটা কিছু করা দরকার। এবার আর কোম্পানির শাসন নয়। ১৮৫৮-এর ১লা নভেম্বর হতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন শুরু। মহারাণীর প্রতিনিধি ভারত সচিব হলেন ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর একটা পরিবর্তন হলো। গভর্ণর জেনারেল নামটা আর থাকলো না। ঐ পদটার নাম হলো ভাইসরয়। আর সর্বপ্রথম ঐ পদে বহাল হলেন লর্ড ক্যানিং। ১৮৫৯-এর একটি আইন দ্বারা ভারত সচিবকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হলো। ইংরেজরা একে জোরগলায় বললো 'ম্যাগনা কার্টা'। আসলে এই আইনে ভারতীয়দের শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থাই থাকলো না। তাই কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এতে ক্ষুব্ধ হন।

কলকাতার মানুষের অসন্তোষ কলকাতাতেই থাকলো না। এটা ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। ইংরেজরা বুঝলো ব্যাপারটা। তাই ১৮৬১তে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হলো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যবস্থা। তেমন কোন রদবদল হলো না। তবে কলকাতার মানুষের একটা অংশ হাতে পেলেন আকাশের চাঁদ। ভারতসচিব থাকেন ইংল্যাণ্ডে আর ভাইসরয় কলকাতায়। এখনকার মত যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ছিল না। তাই ভাইসরয়ই হলেন প্রকৃত শাসনকর্তা। এহেন ভাইসরয়ের কাউন্সিলে মনোনীত হবার সুযোগ পেলেন জমিদার,

অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী ও অন্যান্যরা। ফলে একদিকে ইংরেজতোষণ বাড়লো আর একদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা যে তিমিরে সে তিমিরে। ইংরেজরা দেখলো আটঘাট বাঁধা হয়েছে ভালভাবেই। তাই ১৮৬২তে ক্যানিং সদম্ভে ইংরেজশক্তিকে ভারতের সার্বভৌম শক্তি বলে ঘোষণা করেন। আর দেরী করা ঠিক নয়। বাকী কাজগুলো গুটিয়ে ফেলতে হবে।

দেশীয় রাজ্যগুলোর পিছনে ইংরেজরা লেগেছিল ভালভাবেই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। ইংরেজরা উপকৃত। অনেক দেশীয় রাজ্য সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। ইংরেজরা দেখালো যে তারা নেমকহারাম নয়। মহারাণীর ঘোষণাপত্রের নির্দেশ মত তেউরী, গাড়োয়াল (১৮৫৯), কোলাপুর (১৮৬১) ও ধর (১৮৬৪) রাজ্যগুলো দত্তকদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো। ১৮৭৪-এ কুশাসনের অভিযোগে গাইকোয়াড় মলহর রাও (বরোদা) ক্ষমতা হারালো। ১৮৮১তে আবার রাজবংশের প্রতিনিধির হাতে মহীশূর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল শুরু হওয়ায় ১৮৯০তে মণিপুর ইংরেজদের হাতে এলো। দেশীয় রাজ্যগুলোর সার্বভৌমত্ব আর থাকলো না। রাজন্যবর্গ হয়ে গেলেন ইংরেজদের সেবাদাস। রাজন্যভাতা পেয়েই তারা সুখী।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলো। পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেল। এশিয়ায় আনাগোনা করা অতীতের মতো আর কষ্টসাধ্য নয়। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য দেখে অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মনে ছিল হিংসা, তারাও এশিয়ার দেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব করতে চাইলো। ইংরেজরা চালাক বেশী। অন্যেরা থাবা মারবার পূর্বেই সুযোগ নিতে হবে। তাই ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর নজর গেল ইংরেজদের। গণ্ডামকের সন্ধি (১৮৭৯) দ্বারা আফগানিস্থানকে কব্জা করা হলো। ইঙ্গতিব্বত চুক্তি হলো ১৯০৪-এ। তিব্বতের কাছ হতে ক্ষতিপূরণ আদায় হলো। পিয়ানসিতে স্থাপিত

হলো ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর আধিপত্য রাখতে ইংরেজদের কোন ন্যায়নীতির বালাই ছিল না। আর এটা হওয়া স্বাভাবিক। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অন্যায় কাজটাই হলো ন্যায়।

১৮৫৮ এর মহারাণীর ঘোষণাপত্র ও ১৮৬১ এর ভারতীয় কাউন্সিল আইন ছিল প্রহসনের নামান্তর। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন (১৮৫১) ও ভারত সভা (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাতেই। আর উদ্যোক্তরা ছিলেন কলকাতার লোক। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫-এর ডিসেম্বরে জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন কলকাতায় হয়েছিল। কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয় ২৪শে ডিসেম্বর। ঐ বছরেরই ২৫শে ডিসেম্বর অগাষ্টাস হিউমের নেতৃত্বে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেস দলের সৃষ্টি হলো। কলকাতারই ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

কংগ্রেস তৈরী করাটা ছিল লর্ড ডাফরিনের (১৮৮৪-৮৮) একটা কৌশল। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজদের বিপক্ষে যাতে না যায় সেজন্য একটা অংশকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যেই হিউম ডাফরিণের উপদেশ অনুযায়ী কংগ্রেস দলের পত্তন করেন। কাদের নিয়ে কংগ্রেস তৈরী হয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বোম্বাইর সম্মেলনে "রাণী দীর্ঘজীবী হউন" ধ্বনির মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণায়। এ সময়ে ভারতের কংগ্রেস নেতাদের ধারণা ছিল ইংরেজদের অধীনে থেকেই কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেই যথেষ্ট। কলকাতার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের এই আপোষমূলক মনোভাব মনপ্রাণে কোনদিনই মেনে নেননি।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কিছুই ছিল না। তবু তো কংগ্রেস বলে কিছু একটা হয়েছে। মনের ভিতরকার বিক্ষোভকে চাপা দিয়ে অনেকেই এলেন কংগ্রেসের পতাকা তলে। এরূপ পরিস্থিতিতে

১৮৮৬তে কলকাতায় দাদা ভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হলো। লর্ড ডাফরিণ ১৮৮৮তে কংগ্রেসের কাজকর্মে খুশী হন। বিদায়ের পূর্বে তিনি বলে যান যে কংগ্রেস ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন প্রতিষ্ঠান নয়। তা সত্বেও কংগ্রেস কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবী করলো।

১৮৮৮তে লণ্ডনে স্থাপিত হলো ব্রিটিশ কমিটি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে থাকলেন ইংলণ্ডে। সভাসমিতি ও প্রচারের মাধ্যমে ভারতের দাবী জানাতে থাকেন। আবেদন-নিবেদনের নীতিই এ সময় প্রাধান্য লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ১৮৯২ এর শাসন সংস্কার আইন পাশ হলো। কংগ্রেস এই আইনকে বিরাট সাফল্য বলে ধরে নেয়। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা এতে সন্তুষ্ট হননি। তাদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। এই বিক্ষোভই সৃষ্টি করলো জাতীয়তাবাদ।

লর্ড কার্জন ১৮৯৯তে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা কেড়ে নেন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনেন ১৯০৪-এর আইন দ্বারা। শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে কলকাতার গুরুত্ব কমালেন ১৯০৫-এ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠলো। অরন্ধন, মিছিল ও সভাসমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হলো। রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন করলেন কলকাতারই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করলো আন্দোলনকারীরা। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বয়কট আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন বলে পরিচিত। বয়কট আন্দোলনে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেল। ইংরেজদের হাতে না মেরে ভাতে মারার ব্যবস্থা হলো। কলকাতা হতেই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

কংগ্রেসের নরমপন্থীরা ইংরেজদের তাঁবেদারী না করলেও সমীহ করতো! আবেদন নিবেদন নীতিতেই ছিল তাদের বিশ্বাস। আর চরমপন্থীদের কাছে আন্দোলনই মুখ্য, আপোসটাপোস নয়। তাই ১৯০৬-এর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে দুদলের মতপার্থক্য চরমে

পৌঁছায়। বয়কট আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব নরমপন্থীরা কোনটাই মেনে নেয়নি। ১৮০৭-এর সুরাট কংগ্রেসে কংগ্রেস মনের দিক দিয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেল। কলকাতার বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৫-১৯৩২), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২০), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭১-১৯৫০) প্রমুখ ছিলেন চরমপন্থীদের দলে।

ইংরেজ শক্তি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের কাছে বিরাট ধাক্কা খেলো। অতীতের কলকাতা আর নাই। কলকাতায় ইংরেজদের বশংবদদের তুলনায় ইংরেজ বিরোধীর সংখ্যা অনেক বেশী। তাই কলকাতা ইংরেজদের কাছে আর নিরাপদ নয়। ১৯১১তে তাই আবার কলকাতার গুরুত্ব কমাবার ব্যবস্থা হলো, কলকাতা হতে ১৯১২-এর ১লা এপ্রিল রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। কলকাতার ইতিহাস আবার নতুন রূপ নিল।

কলকাতার গুরুত্ব কমলো ঠিকই। অন্যদিকে কলকাতার গুরুত্ব বাড়লো। ইংরেজরা ২২১ বছর পর কলকাতাকে ভয়ের চোখে দেখলো। এখানেই কলকাতার নতুন ইতিহাস তৈরী হলো।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এদিকে ১৯১১তে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারতে এলেন তাদের সাধের সাম্রাজ্য দেখতে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতের অবস্থাটা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বঙ্গভঙ্গ রোধ করলেন মহানুভব সম্রাট।

ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ বলেই ইংরেজরা এদেশে গড়ে তোলে কৃষিভিত্তিক শিল্প। ১৮৫৫তে কলকাতার কাছে রিষড়ায় প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। হুগলী নদীর দু'তীরে ১৮৭০ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে স্থাপিত হলো অসংখ্য কাগজকল, চটকল ও অন্যান্য শিল্প। রাজেন্দ্রলাল মুখার্জী ১৮৭২-এ একজন ইংরেজকে সহযোগী পেয়ে স্থাপন করেন সুবিখ্যাত মার্টিন অ্যাণ্ড বার্ণ কোম্পানী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি শিল্প স্থাপন করেন। বিড়লাদের মতো অবস্থাপন্ন যারা তারাও কলকাতা

পুরোনো হাওড়ার পুল
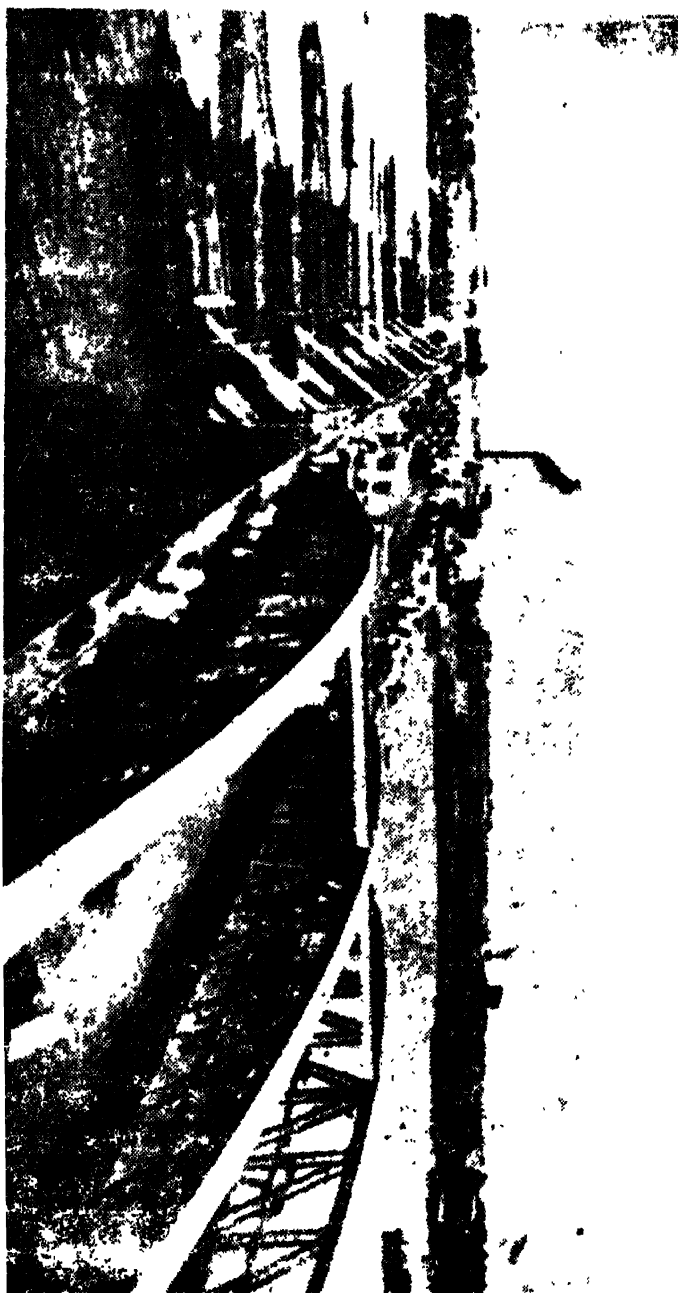
ও কলকাতার আশেপাশে শিল্প স্থাপন করেন। দেশীয় শিল্পপতিদের সাথে ইংরেজ শিল্পপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। দেশীয় শিল্পপতি ও বিদেশী শিল্পপতি নামে দুটো দল তৈরী হলো কলকাতাকে কেন্দ্র করে।

এদিকে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় কলকাতার উন্নতি শুরু হলো। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি সাধন ঘটে। ১৮৭৩ ও ১৮৭৪-এর মধ্যে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে কলকাতা ও হাওড়ার যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরী হলো ভাসমান হুগলী সেতু। নিউমার্কেট তৈরী হলো ১৮৭৪-এ হরলাল শীলের জায়গায়। ১৯১২তে কলকাতার উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য গঠিত হয় ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট। এই সংস্থা ১৯২৬ পর্যন্ত কলকাতার চেহারা দিল পাল্টে। বর্তমান হাওড়ার ব্রীজের কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৩৭-এ। প্রয়োজনের তুলনায় উন্নয়ন কম হলেও এই উন্নয়নকে কলকাতাবাসী মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন।

১৮৬৫তে ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরে জলসরবরাহ প্রকল্প গৃহীত হয়। ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক প্রকল্প রচনা করে ইংলণ্ড যান। ১৮৬৯তে কলকাতাবাসী প্রথম বিশুদ্ধ জল পায়। বিশুদ্ধ জল টালা ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্কে ফলতা হতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হলো। ১৮৬৯-৭০-এ কলকাতার ৪ লক্ষ মানুষের জন্য দৈনিক ৬০ লক্ষ গ্যালন বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা কলকাতার মানুষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বর্তমানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্কটি আর নাই। টালার ট্যাঙ্ক হলো পৃথিবীর বৃহত্তম জলের ট্যাঙ্ক।

১৮৭৩-এর ১১ই নভেম্বর কলকাতা হতে ট্রাম গাড়ী উঠে যায়। কিন্তু শহরের উন্নতি ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মিঃ প্যারিস ও মিঃ সুটারের প্রচেষ্টায় ১৮৯০ এর ২৯শে অক্টোবর শিয়ালদহ হতে বৌবাজার হয়ে লালদীঘি পর্যন্ত আবার ট্রাম চলাচল করে। এ সময় তিনটি ট্রামকে

চারটি ঘোড়া দিয়ে টানা হতো। ১৮৮২তে ষ্টীম ইঞ্জিন দ্বারা ট্রাম চালানোর চেষ্টা করা হলেও তা কার্যকরী হয়নি। কিলবার্ণ কোম্পানি ১৮৯৬-এ প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চালাবার অনুমতি পায়। পরের বছর ২৮শে জানুয়ারী কর্পোরেশন একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০২-এর ২৭শে মার্চ কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে। এসপ্লানেড হতে খিদিরপুর পর্যন্ত প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলেছিল। এ বছরেই সমস্ত লাইন বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগটা ছিল ভারতে ইংরেজদের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুসময়। ভারতে উৎপন্ন ও ইংলণ্ড হতে আমদানি পণ্য ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে লাভের অঙ্কটা বাড়বে না। একথা ইংরেজরা বুঝেছিল বলেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করায় মন দেয়। ১৮৪৮-৫৬তে ভারতে রেলপথ বসানোর কাজ আরম্ভ হলেও ১৮৬৯-৭২-এ লর্ড মেয়ো সরকারীভাবে রেলপথ বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। ইতিপূর্বে ৮টি বেসরকারী সংস্থা রেলপথ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জন রেলওয়ে বোর্ড গঠন করে বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে রেলপথ তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৬২তে কলকাতা হতে কুষ্টিয়া, ১৮৬২-৬৩তে কলকাতা হতে ক্যানিং, ১৮৭১-এ কলকাতা হতে গোয়ালন্দ এবং ১৮৮৩তে কলকাতা হতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। ক্রমে ভারতের অন্যান্য স্থানের সাথেও রেল যোগাযোগ হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথ ১৯২৫-এ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এলো। রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা কলকাতার গুরুত্বকে বাড়ালো।

শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করাতে ইংরেজরা দেরী করেনি। ভাইসরয় ভারত সচিবকে গ্রাহ্যই করতেন না। ১৮৭০-এ কলকাতা ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রথম টেলিফোন চালু হলে ভারতসচিব ভাইসরয়ের উপর খবরদারী করার সুযোগ পেলেন। কলকাতায় সর্বপ্রথম টেলিফোন চালু

হয় ১৮৮১-এ। রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর এলো। পরবর্তীকালে দমননীতি চালানোর ক্ষেত্রেও হলো ইংরেজদের সুবিধা। কলকাতা-বাসীরাও অনেক সুবিধা পেল। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধার সুযোগ পেল বিত্তবানরাই বেশী।

কংগ্রেসের যুব সম্প্রদায় নরমপন্থীদের পছন্দ করতেন না। আন্ত-র্জাতিক ঘটনাবলীও যুবকদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো। বৃটিশ শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণাতো ছিলই। সব কিছু মিলিয়ে যুবমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। এই প্রতিক্রিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সন্ত্রাস-বাদের রূপ নিল।

বিপ্লবী মতবাদ বঙ্গভঙ্গের পূর্ব হতেই কলকাতায় ছিল। ১৯০২-এ কলকাতায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। কলকাতারই ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩—১৯১০) ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। যুগান্তর দল ১৯০৬-এ তৈরী হলো যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠীকে নিয়ে। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও বারীণ ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) ছিলেন এই দলের প্রধান। নিত্যানন্দ কাননগো ফ্রান্সে বিপ্লববাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে ১৯০৮-এ কলকাতায় ফেরেন। তিনিও এই দলে যোগ দেন।

এই দুই বিপ্লবী দলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। কোন কোন সদস্য দুটো সংস্থার সাথেই জড়িত ছিলেন। কলকাতার মুরারীপুকুরে ছিল বিপ্লবীদের আড্ডাখানা। এখান হতেই কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) ও প্রফুল্ল চাকীকে (১৮৮৮-১৯০৮) মজঃফরপুরে পাঠানো হয়। কিংসফোর্ডের উপর বোমা নিক্ষেপের পরেই মুরারীপুকুরে আড্ডাখানায় পুলিশ হানা দিয়ে বারীণ ঘোষ সহ ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। সুরু হলো আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯০৮)। এদিকে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে কানাইলাল দত্ত (১৮৮৭-১৯০৮) ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৮২-১৯০৮) ফাঁসী হয়। মামলায় বারীণ ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। অরবিন্দের পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মামলা পরিচালনা করেন। তিনি মুক্তি পান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে তিনি আধ্যাত্মিক বাদে বিশ্বাসী হন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দ হবার উদ্দেশ্যে ১৯১০-এর এপ্রিলে পণ্ডীচেরী যাত্রা করেন।

১৯০৯ এ যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থামেনি। ১৯১২তে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের অপরাধে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হয়। রাসবিহারী বসুর (১৮৮০-১৯৪৫) উপর এই কাজের দায়িত্ব ছিল। আর তিনি ছিলেন কলকাতারই সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম নেতা।

পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার (১৯১০) আসামী রাসবিহারী বিদেশে চলে যান। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯১৫) যিনি বাঘাযতীন বলে পরিচিত, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। তাঁর আশা ব্যর্থ হলো। শুরু হলো ১৯১০ এর হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা। তাঁর সহযোগী ছিলেন মানবেন্দ্র রায়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হলো তাঁর আসল নাম। বিপ্লবী কার্য-কলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন যতীন দাস (১৯০৪-'২৯)। তিনি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। জেলের মধ্যে ৬৪ দিন অনশন করে তিনি শহীদ হন। কলকাতায় পাতাল রেলে তাঁর নামে একটি ষ্টেশন আছে। ১৯১৭ পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের চেয়ে বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপই ছিল বেশী। এসবের নেতৃত্বে কলকাতার নেতারাই ছিলেন।

১৯৩১তে হিজলী জেলে বটুকেশ্বর দত্ত ও সন্তোষ মিত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সন্তোষ মিত্র কলকাতারই লোক। তাঁর নামানুসারেই 'সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার'।

১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। সূর্য সেন শিক্ষক ছিলেন বলেই মাষ্টারদা বলে পরিচিত। এই মাষ্টারদার রাজনীতিতে হাতে খড়ি কলকাতায়। কলকাতাতেই তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে ১৯২৫ হতে ১৯২৮ পর্যন্ত

জেলে ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান। তাই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ তিনি বেছে নেন। ১৯৩৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারী সূর্যসেন ধরা পড়েন। তাঁর ফাঁসী হলো ১৯৩৪-এর ১২ই জানুয়ারী। মহিলাদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। পুনরায় ১৯৩২-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি চট্টগ্রামের সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করেন। পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে বিষ পান করে তিনি আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহিনী প্রীতিলতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্নাতক ছিলেন।

১৯৩১-এ আলিপুরের সেশন জজ গার্লিককে হত্যা করা হলো। এই বছরের ২৯শে অক্টোবর বণিক সভার সভাপতি ভিলিয়ান কলকাতাতে খুন হন। তারপরই পালা এলো গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা সিমশন সাহেবের। দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১), বাদল গুপ্ত (x -১৯৩০) এবং বিনয় বসু (x -৩১) ১৯৩০-এর ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্সে প্রবেশ করে সিমশনকে হত্যা করেন! পুলিশের সাথে যুদ্ধে তিনজনেই আহত হন। বাদল বিষ পান করে সেই সময়েই আত্মহত্যা করেন। বিনয় দু'দিন পরে মারা যান। ১৯৩১-এর ৭ই জুলাই দীনেশের ফাঁসী হয়। কলকাতার এই ঘটনা অলিন্দযুদ্ধ বলে পরিচিত।

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ হতেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। এতদিনে মনের মতো নেতার খোঁজ তাঁরা পেলেন। একেই বলে কপাল। তা নাহলে আফ্রিকা হতে পাততাড়ি গুটিয়ে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসবেন কেন? রাওলাট বিরোধী আন্দোলনের শেষ পরিণাম ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড! কলকাতা গর্জে উঠলো এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন ইংরেজ প্রদত্ত নাইট উপাধি।

নরমপন্থী গান্ধীজী কতটা নরম তা বুঝতে পারা গেল চৌরীচোরার ঘটনায়। উন্মত্ত জনতার হাতে বাইশজন পুলিশ নিহত হওয়ায় গান্ধীজী

মর্মাহত হন। ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো। গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহার করাকে কংগ্রেসের সবাই মেনে নিতে পারলেন না। যারা প্রতিবাদ জানালেন তাদের মধ্যে কলকাতার বিশিষ্ট নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও ছিলেন। ১৯২৩শে তাই স্বরাজ্যদলের সৃষ্টি হলো। স্বরাজ্য দল ১৯২৪-এ ভারতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করলো। কলকাতার মানুষের কাছে গান্ধীজী প্রথম ধাক্কা খেলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল উঠে গেলেও গান্ধীজীর বিপদ কাটলো না। ১৯২৮-এ কলকাতায় নিখিল ভারত যুবক সম্মেলন হয়। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর তীব্র সমালোচনা করেন।
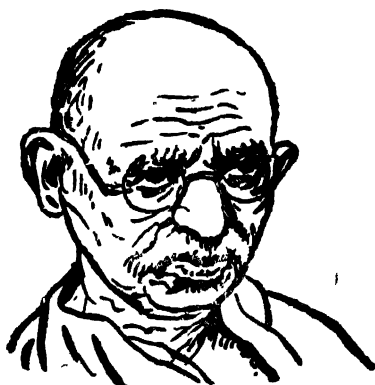
গান্ধীজী

সুভাষচন্দ্র বসু

অনেকে এই সম্মেলনকে কলকাতার প্রথম সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন বলে আখ্যা দেন। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বরাজের জন্য দাবীর প্রস্তাব বাতিল করেন গান্ধীজী। কলকাতার নেতা সুভাষচন্দ্র তাতে দমেননি। গান্ধীজী আর একটা ধাক্কা সুভাষচন্দ্রের কাছে খেলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ধাক্কার চেয়ে এই ধাক্কাটার জোর আর একটু বেশী। ১৯৩৭-এ সুভাষচন্দ্র কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাই নন, তিনি সারা ভারতেরই তখন নেতা। গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইকে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কংগ্রেস সম্মেলনে পরাজিত করলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের এমত অবস্থায় গান্ধীজীর কংগ্রেসে আর থাকা

সম্ভব হলো না। তিনি ১৯৩৯-এ গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক দল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানবার পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘদিনের। ১৯৪০-এ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন চলছিল। সুভাষচন্দ্রকে এ সময় এলগিন রোডের বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়। তিনি রহস্যজনকভাবে পুলিশ প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারী কলকাতা ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি জার্মানী যান। ১৯৪৩-এর ২রা জুলাই তিনি জাপানে পৌছান।

রাসবিহারী বসু টোকিও ব্যাঙ্ককের দুটি সম্মেলনে ইতিমধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুভাষচন্দ্র জাতীয় বাহিনীকে দিল্লী চলো অভিযানে অনুপ্রাণিত করেন। গঠিত হল ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিলো অনেক দেশ। মণিপুর সীমান্ত পর্যন্ত এসে পড়লো আজাদ হিন্দ বাহিনী। ইম্ফল অধিকারের জন্য জোর লড়াই চললো। অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং ১৯৪৫-এ মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণ পরিস্থিতি পাল্টে দিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। নেতাজীর মৃত্যু নিয়েও রহস্য। শোনা যায় ১৯৪৫-এর ১৭ই আগষ্ট ব্যাঙ্কক হতে সায়গনগামী বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের স্বাধীন সরকার নেতাজীর মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন করেনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান কংগ্রেস দলের এটাও একটি ধোঁয়াজাল। অনেকের ধারণা কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরুতে পারে। তাইতো স্বাধীন ভারত সরকার নেতাজীর মৃত্যুরহস্য ধামাচাপা দিল। কিন্তু নেতাজীর জন্য কলকাতার গৌরবতো ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। আবালবৃদ্ধবণিতার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র নেতাজী কলকাতার গৌরব। তাই কলকাতার ইতিহাস নেতাজীকে বাদ দিয়ে হওয়া কি সম্ভব ? কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী আর চরমপন্থী বলে কিছু থাকলো না। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে

সবাই গিয়ে গান্ধীজীর পদতলে আশ্রয় নেন। সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল নেহেরু গান্ধীজীর বিরোধীতা করতেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস বাধ্য হয়েই ছাড়েন। জহরলাল যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি স্বাধীন ভারতের অধিশ্বর হবেন তখন থেকেই গান্ধীজীর বিরোধীতা করা বন্ধ করেন। আসল সমস্যা হলো অন্যখানে। জাতীয় বুর্জোয়ারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ফলে বিপদ দেখা দিল। এরা সামন্ততন্ত্র বিরোধী নয়। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইর জন্য তাই আলাদা সংগঠন তৈরী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবে গোটা পৃথিবীটা চমকে উঠলো। ভারতের শ্রমিকরাও নড়ে-চড়ে উঠেন, সওকত ওসমানী (১৯২২) মস্কো ঘুরে এলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে (১৯২৩-২৫) গড়ে উঠলো মার্কসবাদী চক্র এবং ১৯২৫-এর কানপুরে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে গঠিত হলো কেন্দ্রীয় পরিষদ। কলকাতা হতে কম্ মুজাফ্ফর আহমদ এই সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯২০-২১-এ কলকাতায় মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকা বিক্রয় হতো। লাঙ্গল (১৯১৫) ও গণবাণী (১৯১৬) নামে দুটি পত্রিকা ঐ সময় শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দু'চার কথা বলতে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৯০০-১৯৭৬) ও কমঃ মুজাফ্ফর আহমেদ এই দু'টি পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। কয়েক বছরে অনেক জল গড়িয়ে গেল। কলকাতা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হলো।

১৯৩৬-এ কলকাতার আলবার্ট হলে বঙ্কিম মুখার্জীর আহ্বানে এক কৃষক কনভেনশন হয়। ঐ বছরেই লক্ষৌতে প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার কৃষক কনভেনশন লক্ষৌ সম্মেলনের ভিত্তিতেই আহ্বান করা হয়েছিল। সারা ভারত কৃষাণ সভার ১৯৩৭-এর অধিবেশনে বামপন্থীরা কংগ্রেসের সমান্তরাল শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে কৃষকদের দাবী-দাওয়াগুলো প্রাধান্য পেল। এক কথায় কৃষক সংগঠন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চলে আসে। কলকাতাতেও এর প্রভাব এসে পড়লো।

শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কলকাতাতে শ্রমিকদের চতুর্থ অধিবেশন ও একাদশ সম্মেলন (১৯৩১) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৮-এ কলকাতার আশে পাশে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রেল ধর্মঘট সাফল্য লাভ করে। কলকাতায় শ্রমিকদের চতুর্দশ সম্মেলন ১৯৩৫-এ হয়েছিল। শ্রমিকদের জন্য কংগ্রেস দলের প্রভাবমুক্ত আলাদা সংগঠন এ সময় তৈরী হয়নি ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্পরূপে কমিউনিষ্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ সে সময়কার কলকাতাকে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজ শক্তি আতঙ্কিত হয়েছিল। তা না হলে ১৯৩৪-এ কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার অনুগামী শ্রমিক সংস্থাগুলোকে বে-আইনী করা হলো কেন ? এ সময়ে কলকাতার অনেক কমিউনিষ্ট নেতাই জেলে যান। অনেককে আত্মগোপনও করতে হয়েছিল।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতায় ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর যাই হোক ভারতের অগণিত মানুষ এই আন্দোলনের সামিল হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার এবং সবশেষের নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করলো। নৌ-বিদ্রোহের প্রস্তুতি স্বরূপ গোপন সংগঠন ১৯৪১-এ তৈরী হয়। সংগঠনগুলোতে বামপন্থীদের প্রভাবই ছিল বেশী। নৌ-বিদ্রোহ যখন সাফল্যের মুখে তখন আপোষ হলো ইংরেজদের সাথে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বামপন্থীদের বাদ দিয়েই একাজ করেন। আর একজনের কাজকর্ম বিদ্রোহীদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। তিনি হলেন কলকাতার সাথেই সম্পর্কযুক্ত অরুণা আসফ আলী। যখন একটা আন্দোলন সাফল্যের মুখে তখন এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কি ? আসল কথাটা হলো সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার ভয় কংগ্রেসের বরাবরই ছিল। তাই ভাল করে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাসকে বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেস ঘুরিয়ে দিল অন্যদিকে।

১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলকাতায় ৪ হাজার মানুষ মারা যান

আর আহত হন ২০ হাজার মানুষ। অথচ দাঙ্গার সময় একজন মুসলিম লীগ নেতা ও একজন কংগ্রেস নেতা একই ঘরে বসে আনন্দে মত্ত ছিলেন। কি করে এরূপ নীতিবিরোধী আচরণ সম্ভব? খণ্ডিত স্বাধীনতাতে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না নিশ্চয়ই। পরের বছরে তিন টুকরো হয়ে ভারত স্বাধীনতা পেলো। লর্ড কার্জনের উত্তরসূরীরা মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিলেন ৪২ বছর পরে। কলকাতার গুরুত্ব কি তাতে কমেছে? কেউ কোন স্থানের গুরুত্ব কমাবার মালিক নন। কলকাতা এগিয়ে চললো তার নিজস্ব গতিতে। স্বাধীনোত্তর ভারতে কলকাতা সৃষ্টি করলো নতুন ও সমৃদ্ধশালী ইতিহাস।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, আন্দোলন ও কলকাতার উন্নয়নের সাথে সাথে ১৮৫৮ হতে ১৯৪৬-এর মধ্যে কলকাতায় গড়ে ওঠা সাহিত্য, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ধর্ম, সংবাদপত্রের ভূমিকা, শিক্ষার প্রসার ও জনগণের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সে সব সম্পর্কেও আমাদের ভাবতে হবে।

সমাজ সংস্কারের পথে এগিয়ে চললো বাংলা তথা ভারত। এই সংস্কার আন্দোলনের ঢেউটা কলকাতা হতেই উঠলো। গোড়া ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) তাঁর যুক্তিবাদী মন নিয়ে সমাজের কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বিধবা বিবাহের প্রচলন ও নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলো বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। ঐ সময়ে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯২৫) ও বিপীনচন্দ্র পাল (১৮৫৫—১৯৩২) অসবর্ণ বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে ছিলেন। ১৮৫০-এ প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা' সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষার মতো স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ভূমিকা গ্রহণ করে। বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), ব্রহ্মসমাজের ব্রাহ্মবন্ধু সভা (১৮৬২), বামাবোধিনী (১৮৬৩), ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৬৪), বামাহিতৈষিণী সভা (১৮৭১), বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৭১), আর্যনারী সমাজ (১৮৭৯), বঙ্গমহিলা সমাজ (১৮৭৯), সখি সমিতি (১৮১৬), প্রভৃতি সংস্থা ও পত্রপত্রিকা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব ও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অধিক আগ্রহ দেখান। কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মত ও পথ নিয়ে মতদ্বৈধ হলে কেশবচন্দ্র ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ (১৮৬৬) গঠন করেন। কেশবচন্দ্রের সাথে মতদ্বৈধের ফলে আর একদল কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৮) স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ বলে পরিচিত ছিল। এসব মতদ্বৈধ সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে নারীজাতিকে বর্হিজগতের সাথে পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃকই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহীর বিদ্যুৎসাহিনী সভা (১৮৫৩), রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬—১৯০০) সুরাপান নিবারণী সভা, ও প্যারীচরণ সরকারের বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ (১৮৬৪) ব্যতীত সমাজ উন্নতি বিধায়িণী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা (১৮৬০), হিন্দুমেলা (১৮৬৭), জাতীয় মহাসভা (১৮৭৬) প্রভৃতি সংস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল হিন্দুরাও পতিতোদ্ধার নিবারণী সভা (১৮৫১) স্থাপন করেন। কিন্তু ঐ সময়কার প্রগতিশীল সমাজসেবী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল নগন্য।

ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের মূর্ত প্রতীক রামকৃষ্ণ **পরমহংস দেব** (১৮৩৬—৮৬) নীতি ছিল—মানুষের সেবাই পরমধর্ম। রামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য বীরেশ্বর **বিবেকানন্দ** (১৮৬৩---১৯০২) ১৮৯৩-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পথকে প্রশস্ত করেন। তাঁরই শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা যার পূর্বনাম মার্গারেট তিনি একাধারে আধ্যাত্তিকাবাদের পূজারিণী অপরদিকে রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের সমর্থকরূপে কলকাতার গৌরবকে বৃদ্ধি করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর কলকাতার স্কুল-কলেজের

সংখ্যা বাড়ল। বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি হলো। ১৮৮২-এর হান্টার কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ করলো। ১৯০২-এ গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে ১৯০৪-এর বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন পাশ শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের জঘন্য আক্রমণ হলেও রাশি বিজ্ঞানী উইঃ হান্টার (১৮৮৬), রসায়নবিদ আলেকজাণ্ডার পেডলার (১৯০৪), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৩, ১৯২১), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভূত উন্নতি হয়।

আরও পূর্বে মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ নেন। তিনি ক্যালকাটা জার্ণাল অব মেডিসিন নামক পত্রিকা (১৮৬০) প্রকাশ করেন। তিনি বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতির জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেই সি.ভি. রমণ (১৮৮৮-১৯৭০) নোবেল পুরস্কার পান। রমণের সাফল্যের মূলেও এই কলকাতা।

আশুতোষ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তাঁর সীমিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটান। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন ১৯১৪তে প্রতিষ্ঠা হয়। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের অর্থে রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হবার পর বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আচার্য প্রফুল্ল রায় 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি', মেঘনাদ সাহা 'সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স', জগদীশ বসু, 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' ও প্রশান্ত মহলানবীশ 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করার ফলে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে রসায়ন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'মারকিউরাস নাইট্রেট'. পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার পদার্থের আয়নিত অবস্থা, রসায়ন বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্রের 'আয়োনোস্ফীয়ার' পদার্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'বসু পরিসংখ্যান' সম্পর্কীয় গবেষণা সারা বিশ্বে কলকাতা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এছাড়া

প্রশান্ত মহলানবিশের পরিসংখ্যান সম্পর্কীয় গবেষণা 'দ্বি-বৃত্তকলা' ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার গৌরবকে বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানে দেবেন্দ্রনাথ বসু, রসায়ন বিভাগে প্রিয়দারঞ্জন রায়, বীরেশ্বর গুহ ও কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বিজ্ঞান গবেষণাকে উন্নত করে কলকাতার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই দক্ষ ও সুপণ্ডিত জগদীশ বসুর উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সম্পর্কীয় গবেষণা সারা বিশ্বের মানুষই বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই অসংখ্য সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা কেন্দ্র ও বিজ্ঞান সংস্থা স্থাপন ব্যতীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার বিজ্ঞান শিক্ষাকে উন্নত করেছে।

চারুকলা, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পে কলকাতা অতুলনীয়া। দেশী ও বিদেশী জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রচেষ্টায় বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৮৬৪তে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাশ্চাত্য অনুকরণের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। জাতীয় চেতনার সহায়ক-রূপে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল ব্যতীত ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দকুমার স্বামী, জাপানী শিল্পী ওকাফুরাও অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা যোগান। এই স্কুলের নাম পরে হোল বেঙ্গল স্কুল। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় যুগান্তর আনেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকার, সাহিত্যিক ও স্বর বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। স্বরবিজ্ঞানে তিনি নতুন পথ দেখান কলকাতাকে। সরলাদেবী চৌধুরাণী বিদেশী গান রচনা করতেন। ১৯০৫-এ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে সুর দিয়ে তিনি বিখ্যাত হন। সৌরেন্দ্র-মোহন ঠাকুর বিরাট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ফিলাডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড হতে তিনি সঙ্গীতে ডক্টরেট হন। বিভিন্ন সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন। ইন্দিরাদেবী সঙ্গীত ও সাহিত্য, দেশী ও বিদেশী গান দ্বারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সেতু রচনা করেন।

পুরানো স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির

অঙ্গরূপে কলকাতার চৌরঙ্গীতে যাতুঘর প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত সরকারের যাতুঘর আইন অনুযায়ী ১৮৭৫-এ এর সুদৃশ্য গৃহ তৈরী হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি সৌধ নির্মাণের কাজ ১৯২১-এ শেষ হল। এতে খরচ হয়েছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এই স্মৃতি সৌধের কারুকার্য ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

১৯০৭-এ জোড়াসাঁকোতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে তৈরী হলো অরিয়েন্টাল আর্ট স্কুল। বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলা ও চিত্রকলাকে জীবনমুখী করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অবদানের তুলনা হয় না। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, মুকুল দে, সুরেন কর প্রমুখ প্রাচ্য শিল্প রীতির বিকাশ ঘটান। ভারতীয় ঢঙে। শিল্পরীতির চর্চা করলেন ঠাকুর পরিবারেরই মেয়ে সুনয়নী দেবী। ভাস্কর্য শিল্পে দেবীপ্রসাদ রায় আনলেন যুগান্তর। সবকিছুই কলকাতার গৌরবকে বৃদ্ধি করে।

১৮৪০-এ বোর্ণ ইংলণ্ড থেকে দুটি ক্যামেরা নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতার বাজার তখন রমরমা। তা না হলে ১৮৩৯-এ দ্যাগের ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের একবছর পর কলকাতায় কোন সাহসে বোর্ণ ষ্টুডিও খুলতে সাহস পান? শেফার্ড নামে একজন তার সহযোগী হলে প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড। জনষ্টন ও ইয়াম্যান কলকাতায় ষ্টুডিও খোলেন। কিন্তু ১৮৯১তে জনষ্টন এবং ১৯২১-এ ইয়াম্যান মারা যাওয়ায় সংস্থাটি উঠে যায়। বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড এখনও বর্তমান। অতীতের অনেক স্মৃতিকে এই সংস্থা এখনও আমাদের কাছে তুলে ধরে কলকাতার অতীতের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে চলেছে।

আলিপুরের চিড়িয়াখানা ১৮৬৭তে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। দেশ বিদেশের পশু-পক্ষী জন্তু-জানোয়ারদের এই সংগ্রহ শালা মানুষের এক বিশেষ রুচির পরিচয় বহন করে।

বাঙালীর জীবনযাত্রার মধ্যেও শিল্পচর্চার প্রভাব বর্তমান। খাদ্য গ্রহণে বাঙালীর মতো রুচিসম্পন্ন ও বিলাসপ্রিয় জাতি খুবই কম।

কলকাতায় বর্তমানে অসংখ্য হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট ও মিষ্টির দোকান বাঙালীর জীবনজীবিকার সুরুচি ও কুরুচির পরিচয় বহন করে। মিষ্টির দোকানের রকমারী মিষ্টান্ন বাঙালীর সুরুচির পরিচয় বহন করলেও রসগোল্লা এক বিশেষ খাদ্যদ্রব্য যা প্রত্যেককেই আকর্ষণ করে। বাগ বাজারের নবীনচন্দ্র দাস ১৮৬৮তে সর্বপ্রথম রসগোল্লা তৈরী করেন। রসগোল্লা শিল্পের প্রবর্তকরূপে কলকাতার খাদ্য শিল্পকে নবীনচন্দ্র দাস উন্নত করে বাঙালীর সমাজ জীবনে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

বিনয়কৃষ্ণদেব ১৮৯৩তে তৈরী করেন দি অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস। পরের বছর এর নাম হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রথমে সভাপতি পদে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহ-সভাপতি পদে নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। পুরাতন সাহিত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নাটক অভিনয় ও নাট্যশালার বিবরণ হতে কলকাতার মানুষের বিশেষ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭২ পর্যন্ত কলকাতায় বহু নাটক অভিনীত হলেও কোন নাট্যমঞ্চ ছিল না। কলকাতাবাসীদের মনে তাই দুঃখ ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তার বাগান বাড়ীতে উইলসন রচিত উত্তররামচরিত নাটক অভি নয় করান। ১৮৫৪তে ইংরেজরা অরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে অরিয়েণ্টাল থিয়েটার স্থাপন করে। এখানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় কুলীনকুলসর্বস্ব নামক নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৭তে সিমুলিয়ার ছাতুবাবু শকুন্তলা নাটক ঐ মঞ্চে অভিনয় করান। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বেণীসংহার ও বিক্রম উর্বশী অভিনীত হয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বিদ্যাসাগর ও আরও কয়েকজন মিলে ১৮৫৮তে বেলগাছিয়ায় একটি নাট্যমঞ্চ তৈরী করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হলো।

ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস নিয়ে নাট্যশালা স্থাপনের সাথে নাট্য আন্দোলনও এগিয়ে চলে। অন্যান্য থিয়েটারের মধ্যে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, হিন্দু

ন্যাশনাল থিয়েটার, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, কার্জন থিয়েটার, ক্যালকাটা থিয়েটার, নাট্য নিকেতন ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ক্যালকাটা থিয়েটার পরে বিশ্বরূপা নামে পরিচিত হয়। বর্তমান ষ্টার থিয়েটার, মিনার্ভা, ক্লাসিক, নাট্যমন্দির, রঙ্‌মহল, নবনাট্য মন্দির, নাট্যভারতী, শ্রীরংগম স্থাপিত হয়। এগুলোর মধ্যে সবগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নাট্যশালাগুলোর অবদান কম নয়।

১৮৫৮ হতে ১৯৪৬-এর মধ্যে অগণিত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক ও সমাজসেবী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতাতে অতিবাহিত করে কলকাতার সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কবিদের মধ্যে রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যর নাম উল্লেখযোগ্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্তা মাইকেল তাঁর কবিতায় সুর ও ছন্দের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের সুর, সনাতন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্বদেশিকতার আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুল আজীবনই বিদ্রোহী কবি। কালজয়ী কবি ও সাহিত্যিকরূপে রবীন্দ্রনাথের জুরি মেলা ভার। জীবনানন্দের মত মমতা দিয়ে অন্য কোন কবি বাংলার প্রাণপ্রতিমা রচনা করতে পারেন নি। যুদ্ধ, ক্ষমতা দ্বন্দ্বের লড়াই, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুকান্ত তাঁর কবিতায় ক্রোধ, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। অবশিষ্টরা স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা।

সাহিত্যিকরূপে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর

বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথ চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রসরাজ অমৃতলাল বসু, রাজনারায়ণ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্দিরাদেবী, কবি তরু দত্ত বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। তবে তিনজনের নাম উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ ও আনন্দমঠ রচনার জন্য এবং শরৎচন্দ্র নারী দরদী সাহিত্যিকরূপে বিখ্যাত এবং মানিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন মানবতার পক্ষে দায়বদ্ধ শিল্পী।

নাট্যকাররূপে নীলদর্পণের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র, মতিলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশ ঘোষ এবং নাট্যশিল্পীরূপে শিশির ভাদুড়ী, চিকিৎসকরূপে মহেন্দ্রলাল সরকার, নীলরতন সরকার, সুবোধকুমার মিত্র, বিধানচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিকরূপে যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, দর্শনকরূপে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গণিতবিদরূপে আনন্দমোহন বসু, অর্থনীতিবিদরূপে বিনয়কুমার সরকার ও আইনজ্ঞরূপে রমেশচন্দ্র দত্ত, সমাজসেবীরূপে রাসবিহারী ঘোষ, সুবোধ মল্লিক, সাংবাদিকরূপে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবীরূপে কালীপদ মুখার্জী, কিরণচন্দ্র মিত্র, কিরণশংকর রায়, জগমোহন বসু, সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র নস্কর, পেরী সেনগুপ্তা, অ্যালী সামন্ত, বীরেন্দ্র শাসমল প্রমুখ কলকাতায় সুবিখ্যাত ছিলেন। আরও অসংখ্য জ্ঞানী ও গুণীজন কলকাতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রত্যেকের পরিচয় তো দূরের কথা নাম উল্লেখ করাও দুঃসাধ্য। কলকাতার গৌরব এঁরা প্রত্যেকেই।

খেলাধূলাতে কলকাতা পিছিয়ে থাকে নি কোনদিন। কলকাতার সুবিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাবের জন্ম ১৮৮৮তে। ১৮৯১তে আই, এফ, এ, শীল্ড চালু হয়। মোহনবাগান ইয়র্কসায়ারকে ২-১ গোলে হারিয়ে কলকাতায় ইংরেজ বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত ট্রেডস কাপ ১৯০৬ ও ১৯০৮-এ মোহন-

বাগান লাভ করে। সুবিখ্যাত খেলোয়াড় গোষ্ঠপাল ১৯১৩তে মোহনবাগানে যোগ দেন। বর্তমান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯২৫ হতে প্রথম ডিভিশন খেলতে আরম্ভ করে এবং মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। শরীরচর্চা ও অবসর বিনোদনে খেলাধূলার গুরুত্ব কলকাতাবাসী সুদূর অতীত থেকেই উপলব্ধি করে আসছে। কলকাতা চিরদিনই খেলায় চঞ্চল।

সংবাদপত্রের ভূমিকা সমস্ত কিছুর মূলে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো কলকাতায় স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। সমাজ-সংস্কারেও একসময় সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর হিন্দু প্যাট্রিয়ট, দৈনিক বসুমতি, আনন্দবাজার, ফরওয়ার্ড, যুগান্তর, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আজাদ ও স্বাধীনতা কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করে নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় দেন। ১৮৭৮-এ সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আইন পাশ হবার পর শিশিরকুমার ঘোষ রাতারাতি তাঁর বাংলা পত্রিকাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রের ভূমিকা অসাধারণ ছিল। 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই বামপন্থী পত্রিকারূপে পরিচিতি লাভ করে।

এই সময়ের সাহিত্য, সংবাদপত্র ও নাটক হতে কলকাতার সমাজ-জীবনের চিত্র ফুটে উঠে। নীলদর্পণ নাটক ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কে জোরালো আলেখ্য। সংবাদপত্রগুলো ছিল জাতীয়তা-বাদের সমর্থক ও প্রচারক। অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পাল জমিদার ও ইংরেজদের স্বার্থেই হিন্দু প্যাট্রিয়ট পরিচালনা করতে থাকেন। লোকনাথ ঘোষের 'কলকাতার বাবুবৃত্তান্ত', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', কালীপ্রসন্ন সিংহীর 'হুতুম পেঁচার নকসা', ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজচিত্র' নামক পুস্তক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্ত

কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান ব্যক্তিদের স্বভাবচরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে আমাদের তথ্য জানতে সাহায্য করে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) ও শহীদের ডাক নিয়ে এলো এক নতুন আহ্বান। ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরাজয়, সমাজতন্ত্রী শিবিরের জোয়ার এবং কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সম্পর্কে পূর্বে অনেকেই ভাবেন নি। সুকান্তর পরে বাংলা কবিতা বাংলা সাহিত্যে একই ভূমিকা পালন করলো। চল্লিশ শতকের একদল কবি বিজন ভট্টাচার্যের সাথে সমানে তাল মিলিয়ে কলকাতার সাহিত্যকে দেখালেন এক নতুন পথ। কলকাতার ইতিহাসের তাৎপর্য এখানেই।

পঞ্চম অধ্যায়

(১৯৪৭-১৯৯০)

কলকাতার মানুষ ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কথা তখনও ভোলেনি। ১৯৪২-এর আন্দোলন, যুদ্ধ কালীন বোমাতঙ্ক, নৌবিদ্রোহের ঘটনা তাদের স্মৃতি হতে মুছে যায়নি। এমত পরিস্থিতিতে ডাক্তার যেমন বাধ্য হয়ে সার্জারী পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব করান, স্বাধীনতাও সেভাবে এলো। ভারতকে অপারেশন করে তিনটি ভাগ করা হলো। দেশ ভাগ হবে একথাটা কলকাতার মানুষ কংগ্রেসের নরম মনোভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিল। একটা দেশেতো দুজন প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। তাই দেশ ভাগ অবধারিত। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা পেল। কলকাতার কপাল ভাল, বড় ভাগটার মধ্যেই কলকাতা পড়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর কট্টর গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হন। ডাঃ বিধান রায় (১৮৮২-১৯৬২) এসময় বিদেশে ছিলেন। প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা পাঁচ মাস টিকেছিল। ১৯৪৮-এর জানুয়ারী বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। কতিপয় কংগ্রেস সদস্যর অনুরোধে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছিল। বিধানচন্দ্র ১৯৫২ ও ১৯৫৭তে নির্বাচনে জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৬২তে মারা গেলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। একটানা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের রাজত্ব চললো। ১৯৬৭তে কংগ্রেস হেরে যায় পশ্চিম বাংলায়। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হন। এ সরকার ৭ মাস টিকলো। আবার ১৯৬৯-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলো। আবায় অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হন। এবার মন্ত্রীসভা ১৩ মাস বেঁচেছিল। আবার ১৯৭১-এ নির্বাচন হয়। তাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার সহযোগিরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও মন্ত্রীসভা তৈরী করার

সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৭২-এ হল জালিয়াতী নির্বাচন। দেশবন্ধুর নাতি সিদ্ধার্থ শংকর রায় মুখ্যমন্ত্রী হন। তারপরে ১৯৭৭-এর নির্বাচন। নতুন জমানা এলো। এবার আর যুক্তফ্রন্ট নয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। তবু বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভা হলো। জ্যোতি বসু ১৯৮২তে ও ১৯৮৭তে বামফ্রন্ট জেতার ফলে মুখ্যমন্ত্রী হন। এখন পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল আছেন।

বিধান রায়কে বাংলার রূপকার বলা হয়। তাঁর আমলে কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার ব্যাপক উন্নতি হয়। তিনি ১৯৫৪তে নিউ

শ্রীজ্যোতি বসু

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়

সেক্রেটারিয়েট ভবন, দিল্লীতে বঙ্গভবন (১৯৫০) তৈরী করেন। ১৯৫৯-এ কলকাতায় প্লাষ্টিক শিল্পের তিনি প্রবর্তন করেন। কলকাতা ও তার আশেপাশে ১৯৬১তে অসংখ্য কলকারখানা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণের প্রস্তাব এ বছরেই গৃহীত হয়। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২-এ এই সেতুর উদ্বোধন করেন। ১৯৭৪তে সি, এম. পি, এ ও ১৯৭০-এ সি, এম. ডি, এ তৈরী হলো। কংগ্রেস সরকারের আমলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হল। সরকারী বাস বিধানচন্দ্র রায়ই কলকাতায় চালু করেন। শিয়ালদহের ফ্লাইওভার ও ইষ্টার্ন বাইপাস তৈরী, জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও বস্তি উন্নয়ন হলো। পাতাল রেলের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭৩-এ বামফ্রন্টের আমলে। ১৯৮৪তে এসপ্লানেড

হতে ভবানীপুর পর্যন্ত প্রথম পাতালরেল চালু হয়। চক্ররেল চালু হলো ১৯৮৫তে। কলকাতার উন্নয়ন হয়েছে ঠিকই. কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম।

কলকাতার উন্নয়ন হলেও সারা দেশের সংকটের সাথে কলকাতাতেও সংকটের ছোঁয়া লাগলো। মানুষতো বসে মার খাবে না। কলকাতা তাই বারে বারে আন্দোলনে উত্তাল হয়েছে। ১৯৫৩তে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন হল। আবার ১৯৬৬তে ট্রাম শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করে সফল হয়। ঐ বছরই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন সারা বাংলায় সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলন কলকাতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকারকে কাঁপিয়ে তোলে। এই আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি এক হতে না পারা সত্ত্বেও ১৯৬৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ভরাডুবি হয়।

স্বাধীনতার পর কলকাতায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে আলাদা করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১তে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। এই সংস্থা ১৯৫৩ হতে কাজ শুরু করে। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হলো। ১৯৬২-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। অসংখ্য লাইব্রেরী ও নাট্যমঞ্চ স্থাপনের জন্য এ সময়টা প্রশংসার দাবী রাখে। বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট (১৯৫৩), রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১৯৫৬), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী (১৯৫৪) স্থাপিত হয়। অসংখ্য থিয়েটার ও নাট্যমঞ্চের মধ্যে থিয়েটার সেন্টার, বিশ্বরূপা, মহাজাতি সদন, শ্রীশিক্ষায়তন, মুক্তাঙ্গন, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্, গিরীশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, অহীন্দ্র মঞ্চ, বিজন থিয়েটার উল্লেখযোগ্য।

খেলাধূলায় কলকাতার মানুষের অনুরাগ দীর্ঘদিনের। মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষ উৎসব হয়ে গেল। অসংখ্য খেলার মাঠ কলকাতায়। ইডেন, নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়াম। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কলকাতার গর্বের বিষয়। ১৯৭৮-এর ২৮শে জুন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কাজ

আরম্ভ হলো। ১৯৮৪-এর ২৫শে জানুয়ারী এর উদ্বোধন হয়। এখানেই ১৯৮৭-এর ২০ হতে ২৭শে নভেম্বর তৃতীয় সাফ গেমস হয়েছিল। সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলে ১৯৭৭-এর ২২শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসেন এবং ২৪শে তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর অসংখ্য ফুটবল ক্লাব, ব্যায়াম চর্চা কেন্দ্র ও সংস্কৃতি সংস্থা গড়ে উঠেছে।

অতীতের কলকাতার দিকে ফিরে তাকাতে হয় আর একবার। ১৯৫৬-এর ২৩শে জানুয়ারী বিধান রায় বাংলা বিহারকে যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। এ ঘটনার অল্পদিন পরেই মেঘনাথ সাহার মৃত্যুতে উত্তর পশ্চিম কলকাতায় উপনির্বাচনে হলে মোহিত মিত্র (১৮৯৮-১৯৮৬) জয়লাভ করেন। বিধান রায়ের এ এক বিরাট পরাজয়। বাংলা বিহার আর যুক্ত হলো না। ১৯৬২তে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। এ নিয়েও কলকাতায় ঢেউ উঠলো। কলকাতার মানুষ তাদের প্রিয় নেতার এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না।

স্বাধীনতার পূর্বে দুর্ভিক্ষ, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, ও যুদ্ধকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল নতুন সাহিত্য। বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার পরে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় হারিয়ে যান। সত্তর দশকে কলকাতা সৃষ্টি করলো নতুন সাহিত্যের যুগ। সন্ত্রাসবাদ ও স্বৈরতন্ত্রবিরোধী কবিতা ও সাহিত্য তৈরী হলো। অগণিত নতুন কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলো। যুগের সাথে তাল মেলাতে না পেরে হারিয়ে গেলেন অনেকেই।

স্বাধীনতার পূর্বে সুকান্তর কবিতা ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। ১৯৭৭-এর পরে অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার ও নাট্যদল অভিনয়ের মাধ্যমে কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলাকে মাতিয়ে তোলে। চীৎপুরের পেশাদারী যাত্রাদলগুলোও 'কালমার্ক্স', লেনিন প্রভৃতি যাত্রা অভিনয়ের মাধ্যমে সন্ত্রাসের যুগ হতেই জনগণের মানসিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চললো।

১৯৭৭-এর পরে কলকাতায় এলো এক নতুন যুগ। পরীক্ষায় গণ

টোকাটুকি বন্ধ হলো। লম্বা চুল ও গালপট্টা জুলফীর প্রবর্তন হয়েছিল সত্তর দশকে। সুস্থ সংস্কৃতির প্রভাবে ঐসব কু-অভ্যাস ক্রমে ক্রমে দূর হতে থাকে। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এলো স্বাধীনতা। অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন যেগুলো হারিয়ে গিয়েছিল ১৯৭২ হতে ১৯৭৭-এর প্রথমার্ধের মধ্যে সেগুলো আবার চালু হলো। কলকাতায় এলো এক উত্তরণের যুগ। সন্ত্রাসের যুগে নতুন ধরণের গল্প ও কবিতার সৃষ্টি হলো।

১৯৭৭-এর পর বামফ্রন্ট কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার উন্নতির ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনকেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। আরও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বামফ্রন্ট নেতারা বলেন যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠেছে। জ্যোতি বসু কলকাতা হতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের যে দাবী জানান তা ভারতের সবরাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও এই দাবী প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিধান রায়কে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কেন্দ্রের সাথে বিধান রায়ের উদ্বাস্তু সমস্যা ও পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন নিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সমস্যারই তিনি মোকাবিলা করেছেন সঠিক ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে। মিছিলে মিছিলে কলকাতা তখন উত্তাল। বামপন্থী শক্তির নতুন জাগরণ তখন কলকাতায়। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গুলিও চলেছিল বিধানচন্দ্রের আমলে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুবছরও যায়নি। বিধান রায়ের মন্ত্রীসভার বয়সও তখন এক বছরের কিছু বেশী। ঐ সময়ই রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতা উত্তাল হলো। ১৯৪৯ এর ২৭শে এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ভারতসভা হলে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক সভা হলো। সভার পর মহিলা ও ছাত্রদের মিছিল। ইতিমধ্যে কলকাতাকে অনেকেই মিছিলের নগরী আখ্যা দিয়েছেন। দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা কেন আন্দোলন করবে? কংগ্রেস

স্বাধীনতা এনেছে। অতএব তার সাতখুন মাপ। মহিলা ও ছাত্রদের মিছিল সেই বিধান রায়ের সরকারের গাত্রদাহ সৃষ্টি করলো। গুলি চালানো হলো মিছিলের উপর। লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, গীতা সরকার ও বিমান ব্যানার্জী নিহত হন। স্বাধীনতা লাভের পর কলকাতা নগরী হলো কলঙ্কিত। জনগণের কাছে বিধান রায়ের সরকারের ভাবমূর্তি অনেকটা কমে গেল।

১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পর ১৭ই মার্চ সারা বাংলায় হরতাল হলো। কলকাতাও হলো স্তব্ধ। তারপর থেকেই সন্ত্রাস শুরু। কলকাতাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো সারা পশ্চিম বাংলায়। এ বছরেই কলকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় ৫ শত মানুষ খুন হন। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরও আক্রমণ শুরু হলো। কলকাতার সিনেট হলে ১৯৭১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ছিঁড়ে ফেলা হয়। কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত হলো আরও বেশী ১৯৭২-এর নির্বাচনের পরে। একদিকে খুন, জখম চললো ; অন্যদিকে দমনমূলক আইনে জেল, গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা। সংবাদপত্রের পাতাগুলো সাদা। রবীন্দ্রনাথ ও জহরলালের বক্তব্যও ছাপানো বন্ধ হয়। প্রকারান্তরে একশত বছর পরে আবার চালু হল সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন। মানুষের আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না। সাহিত্যিক ও শিল্পীরাই কলকাতায় গ্রহণ করলো মুখ্য ভূমিকা। ১৯৭৫-এর ১৭ই ও ৩০শে এপ্রিল কম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনামের সংগ্রামী জনগণের সমর্থনে মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে মিছিল এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতার মানুষের মনের তীব্র বিক্ষোভ দমননীতি সত্ত্বেও হঠাৎ ফেটে পড়লো। সে এক উত্তাল জোয়ার। ১৯৭৫ এর ৫ই জুন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষের পদযাত্রা ও মিছিল হলো গণতন্ত্র রক্ষার দাবীতে। কয়েকদিন পরে ২৫শে জুন জরুরী অবস্থা জারী হল। আবার মানুষ চুপ। মনেতে বিক্ষোভ ও ক্রোধ। ভয়ে কথা বলবার সাহস নাই। সাথে সাথে

আন্দোলনও চললো। এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে যাওয়া এই দুইয়ের মিলনে এলো ১৯৭৭। মানুষ পেল মুক্তির স্বাদ। কলকাতার বুকে সূচনা হলো এক নতুন যুগের।

মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকাকালীন ১৯৮৮-এর ২২শে আগষ্ট রাজভবনে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ চুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘদিনের মদত পাওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে কিছুটা কব্জা করার ব্যবস্থা করলেন জ্যোতি বসু।

১৯৮৮ ও ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য স্বনামধন্য ব্যক্তির জন্ম শতবার্ষিকী এ বছর কলকাতায় পালিত হয়েছে। আবার অসংখ্য ভাল কাজের জন্য ১৯৮৯ বছরটি কলকাতায় স্মরণীয়।

এ বছর কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মুজফফর আহম্মদ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম শতবার্ষিকী, বিদ্যাসাগরের ১৬৯ তম জন্ম-বার্ষিকী, শহীদ সিধু ও কানুর জন্ম শতবার্ষিকী ও শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 'চলচ্চিত্র ও ফরাসী বিপ্লব' উৎসবের উদ্বোধন উৎসব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসী রাষ্ট্রদূত লিউইন ও সত্যজিৎ রায় এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরই ২রা অক্টোবর পার্কসার্কাসে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি উদ্বোধন করেন জ্যোতি বসু। সর্দার হাসমীর জন্মদিন ১২ই এপ্রিল পালিত হয়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হলো নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়ামে। এ বছরই সল্টলেককে নোটিফাইড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়। সল্ট-লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত সম্পর্কে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। শহীদ কানাইলালকে এ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মরণোত্তর বি, এ, ডিগ্রী দেওয়া হয়। শহীদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পী ও শিল্পকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে ১৯৮৯-এর কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৮৯-এর কলকাতা আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণে। ২৪শে

নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নবম সাধারণ নির্বাচনে কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকা হতে কংগ্রেস মুছে গেল। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কলকাতায় কংগ্রেস জিতেছে।

১৯৮৭ হতে ১৯৮৯-এর মধ্যে অসংখ্য রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, শিল্পী ও সাহিত্যিককে কলকাতা হারিয়েছে। অনেকের বিয়োগ ব্যথা স্মৃতি হতে মুছে গেলেও তৃপ্তি মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি মানুষ এখনও ভোলেনি।

১৬৯০-এর ২৪ আগষ্ট জোব চার্ণক কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন নৌকায় থাকতেন আর মনে মনে ভাবতেন কুঠী নির্মাণের কথা ও বাণিজ্যের কথা। ১৯৯০-এর ৬ই জানুয়ারী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বামফ্রন্টের বিজয় উৎসবে কমরেড জ্যোতি বসু (পিতার নাম নিশিকান্ত বসু, মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী) জনগণকে সজাগ হবার আহ্বান জানান। কম্ জ্যোতি বসুকেও জোব চার্ণকের মতো ভাবতে হয়। তবে সে ভাবনা অন্য ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের আটকে যাওয়া প্রকল্পগুলো কিভাবে আদায় করা যায় এটাই ১৯৯০তে তাঁর বড় ভাবনা।

১৯৮৯-এর ২৬শে আগষ্ট শিশির মঞ্চে কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কীয় এক আলোচনা চক্রে মেয়র কমল বসু বলেন "আমাদের জাতীয় জীবনে কলকাতার গুরুত্ব আছে"। জোব চার্ণক ও কমরেড জ্যোতি বসুর ভাবনাচিন্তার পার্থক্য ও কমল বসুর এই বক্তব্যই কলকাতার তিনশত বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে সূচিত করে।

অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা বর্তমান কলকাতায় উপস্থিত হয়েছি। কলকাতার আয়তন বেড়েই চলেছে। বৃহত্তর কলকাতার আয়তন বর্তমানে ১০৪ বর্গ কিঃ মিটার। বৃহত্তম কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ। মূল শহরের লোকসংখ্যাই ৩৩ লক্ষ। বর্তমানে কলকাতার থানার সংখ্যা ৪২টি। পুলিশ প্রশাসনের দিক হতে কলকাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে বৃহত্তর কলকাতার

উত্তরের অনেকটা উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণের অনেকটা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ. বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, স্কোয়ার, পার্ক ইত্যাদিতে কলকাতা ভারত তথা পৃথিবীতে এক বিশেষ স্থানের অধিশ্বরী। কলকাতাকে এগুলো সমৃদ্ধ করেছে। কলকাতায় হাসপাতালের সংখ্যা ১৬টি। এগুলোর মধ্যে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর কলেজ, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি প্রধান। কলকাতায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যথা কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী। এই শহরে অসংখ্য কলেজ বর্তমানে। এগুলোর মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, বেথুন কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সি, টি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ. সুরেন্দ্র নাথ কলেজ, উল্লেখযোগ্য। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, প্রভৃতি স্কুল অতীতের অনেক স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলকাতায় অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। শহীদ মিনার, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ, আকাশবাণী ভবন, পরেশ নাথের মন্দির, নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়াম, ফোর্ট উইলিয়াম, রাইটার্স বিল্ডিং, ইডেন গার্ডেন, রাজভবন, হাইকোর্ট, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, হাওড়ার সেতু. নাখোদা মসজিদ, সেন্ট জন্ গীর্জা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় রয়েছে অসংখ্য নাট্যমঞ্চ, লাইব্রেরী ও প্রেক্ষাগৃহ। ষ্টার, মিনার্ভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, যাদুঘর, একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ. বসু বিজ্ঞান মন্দির ইত্যাদি অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

কলকাতার পরিবর্তন দেশ বিভাগের পর হতেই দ্রুতহারে ঘটেছে। আমরা রাস্তাঘাট, বাড়ী. স্মৃতিসৌধ, স্কোয়ার, পার্ক ইত্যাদির নাম পরিবর্তন করেছি। দু-একটি উদাহরণই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের নাম হয়েছে লেনিন সরণী। ওয়েলিংটন স্কোয়ার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,

অকটরনালী মনুমেণ্ট—শহীদমিনার, ডালহৌসী স্কোয়ার—বিবাদী বাগ, ল্যান্সডাইন রোড—শরৎবসু রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—রামমোহন সরণি নামে পরিচিত। কলকাতার প্রায় সমস্ত রাস্তারই নাম পরিবর্তন হয়েছে। অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের আমরা মুছে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছি। বিদেশী শাসকদের মর্মর মূর্তি অপসারিত হয়েছে। কলকাতার পথে-ঘাটে মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কালমার্কস, এঞ্জেলস্, লেনিন, সারদামণি, প্রমুখ দেশী বিদেশী জ্ঞানী ও গুণীজনের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ নই। হেয়ার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন হয়নি। ডেভিড হেয়ারের মূর্তিও অপসারিত হয়নি। হেয়ার স্কুলের নামও বদলায়নি। বিজ্ঞজনের সম্মান কলকাতা দিয়ে এসেছে। দেশ-বিদেশের সীমারেখা এক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি।

কলকাতা কর্পোরেশন ও সি, এম, ডি-এ কলকাতার উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রেখে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় কলকাতার উন্নয়ন চলছে এগিয়ে। পাতাল রেল, চক্ররেল, অসংখ্য উড়াল পুল, সাবওয়ে, দ্বিতীয় হুগলী সেতু এই উন্নয়নের প্রমাণ। রাস্তাঘাট নতুন করে তৈরী হচ্ছে। কবি নগেন্দ্রনাথ পালের কথায় আবার বলতে হয়—"সেই থেকে কাটাকাটি সমানে চলেছে"।

কলকাতার রাস্তায় বেড়োলে ফুটপাথে হকারদের ভীড়, মূলরাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত নোংরা জলের ঢেউ, যানজট, পথ দুর্ঘটনা, বাস ও ট্রামের ভীড় কলকাতাকে অসহনীয় করে তোলে। চোর, বদমায়েস, ডাকাত, মাতালের সংখ্যা কলকাতায় কম নয়। হোটেলে আভিজাত্য সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেলেল্লাপনা সমানে চলেছে। চোরা চালান বিশেষ করে ড্রাগ ব্যবসা ও ড্রাগ আসক্তি কলকাতার বর্তমান প্রধান সামাজিক ব্যাধি। রাজনীতি ও দেশসেবার দোহাই দিয়ে স্কুল, কলেজ, অফিস আদালতের কাজকর্মে ফাঁকি কলকাতায় আর এক নতুন সামাজিক ব্যাধি। বার বার বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজকর্মে ফাঁকি দেবার প্রবণতার ঢেউ সারা পশ্চিমবাংলায় কলকাতা হতেই ছড়িয়ে

পড়েছে। ইদানীং কালে ষ্টোনম্যান নামক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে মোট এগার জন পথচারীর মৃত্যুজনিত ঘটনা কলকাতায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

এ সমস্ত সমস্যা থাকা সত্বেও কলকাতায় শান্তিতে থাকা যায়। এখানে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব কম। ভারতের অন্যান্য শহরের চেয়ে এখানে খুন-জখমের ঘটনা কম। রাত এগারটাতেও মেয়েরা মানসম্মান নিয়ে কলকাতায় চলাফেরা করেন। ভারতের অন্যান্য শহরে এটা ভাবাই যায় না। অনেক ভুলভ্রান্তি, বেলেল্লাপনা ও অপসংস্কৃতির মধ্যেও কলকাতায় গড়ে উঠেছে সুস্থ সংস্কৃতির এক পরিবেশ। কলকাতার বিরাট আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কলকাতার ত্রুটি কতটুকু এ কথাই আমাদের সর্বাগ্রে ভাবতে হবে। কলকাতার রাজনৈতিক শ্লোগান অতীতের মত এখনও সারাভারতের রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হচ্ছে। কলকাতার বিশেষত্ব এখানেই।

সল্টলেক ষ্টেডিয়ামে ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার তিনশত বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতায় উন্নতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছ হতে আশ্বাসবাণী পাওয়া গেছে। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকাতাকে কিভাবে গড়ে তোলা হবে সেটাই হল বর্তমানে প্রধান সমস্যা। ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের সাথে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীবদের মেকী প্রতিযোগিতা চলছে কলকাতায়। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীবদের পিছু হটতে হচ্ছে। ভুলটা বুঝতে পেরে তাঁরা সংগ্রামী হয়ে উঠছে। কলকাতার পথঘাটে যারা বাস করেন তাদের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশ হাজার। সভ্যযুগে এ ঘটনা নিয়ে কি আমরা গর্ব করতে পারি? কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে শ্রেণীসংগ্রামের এক বিশেষ রূপ। আর এর রূপকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই শ্রেণীসংগ্রামের রূপই হল জীবন। আর এই জীবনই হল কলকাতার ইতিহাসের বিরাট বিশেষত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সাংস্কৃতিক আন্দোলন অতীত ও বর্তমান (১৯৮০)—গঃ কঃ কুঃ

২। কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—অতুলকৃষ্ণ রায়।

৩। জোব চার্ণকের কলকাতা—পূর্ণেন্দু পত্রী

৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বাংলা সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

৫। নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস—ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

৬। কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত—লোকনাথ ঘোষ

৭। প্রাক্ পলাশীর বাংলা—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

৮। বাংলার আর্থিক ইতিহাস— ঐ

৯। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ—নিখিল সুর

১০। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়—ফকিরচন্দ্ররায়

১১। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল

১২। হাইকোর্টের ১২৫তম বার্ষিকী জার্নাল

১৩। বর্তমান পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

১৪। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

১৫। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কথা—কমলকুমার সান্যাল

১৬। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম/২য় খণ্ড)—সুকুমার সেন

১৭। মৃত্যুঞ্জয়ী—মহাজাতী সদন

১৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস—প্রগতি প্রকাশন—মস্কো

১৯। বাংলা গদ্য চর্চা ও বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী—ডাঃ অপূর্বকুমার রায়

২০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের কৃষক—বদরুদ্দীন ওমর

২১। কলকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

২২। কলকাতা—নগেন্দ্রনাথ পাল

২৩। ভ্রমণ কাহিনী/১ম/২য় খণ্ড—পূঃ রেলওয়ে

২৪। হুগলী জেলা পরিষদের স্মরণীকা (১৯৮৭)

২৫। নূতন স্বদেশ কথা—কিরণচন্দ্র চৌধুরী।